KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ মনোহর দাস স্ট্রীট, কল ৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 11/4 12/2 12/3 12/4	Year of Publication : Oct 1988 May 1989 July 1989 July-Sep 1989
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সংখ্যা ৪৫

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্প্রতি প্রকাশিত

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে

বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রথীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত এবং রথীন্দ্রনাথের রচনা, অঙ্কিত চিত্র, আলোকচিত্র-সংবলিত।

মূল্য ৪৫'০০ ; শোভন ৬০'০০

সূর্যাবর্ত

রবীন্দ্র-কবিতা-সংকলন

'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে শুরু করে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কবিগুরুর কবিতাগ্রন্থ থেকে বাছাই করা ২৭২টি কবিতার সংকলন। আলোকচিত্র, পাণ্ডুলিপিচিত্র ও রঙিন চিত্রে শোভিত।

মূল্য ৬৫'০০ ; শোভন ৭৫'০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-বিষয়ক দেশী বিদেশী বিদগ্ধ লেখকগণের রচনা সংবলিত বাংলা ও ইংরেজি স্মারকগ্রন্থ

আলোকচিত্র, অঙ্কিতচিত্র ও পাণ্ডুলিপিচিত্র সংবলিত।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষা সংখ্যা. ১৩৯৬

ত্রয়োদশ বর্ষ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

প্রবন্ধ :		
বিতর্কিত বাংলা রেনেসাঁস ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীরা	১	নমিতা বসু মজুমদার
উত্থিত বিষাদ : হে সারথি রথ প্রস্তুত করো	২৫	পথিক বসু
কবিতাগুচ্ছ :		
আনন্দ ঘোষ হাজরার কবিতা	৪১	গৌতম গুপ্ত
প্রবন্ধ :		
আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবনে টেলিভিশনের অভিঘাত	৪৫	কেতকী কুশারী ডাইসন
কবিতায় মহাকাশ	৬৬	প্রদীপচন্দ্র বসু
আলোচনা :		
পুনরাবৃত্তির পুরস্কার	৭৬	পিনাকী ভাদুড়ী
কবিতাগুচ্ছ :		
পার্থসারথি চৌধুরীর কবিতা	৮৪	গৌতম গুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

অরূপ দত্ত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত ও টেকনোপ্রিন্ট, 7 হৃষিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বিভাব তেরো বছরে পড়ল। সময়ের এই পরিসরে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি সৎ মননশীল সাহিত্য পরিবেশনায়। সাধ যত ছিল, সাধারণ নিয়মে সাধ্য ততটা না থাকলেও, আমরা ইতিমধ্যে এমন কটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরেছি যার প্রবহমান গবেষক-চাহিদা আমাদের প্রকাশনাক্লান্ত স্নায়ুকে নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত করেছে। পাঠক গবেষকের এই অফুরান উস্কানির কারণেই বিভাব এখনো বন্ধ হয়নি।

ছোটো কাগজ সময়ের আগে ছোটে। অন্তত সব সৎ ছোটো কাগজের তাই চরিত্রলক্ষণ হওয়া উচিত। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-রূপান্তর, এমন কি রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-বদলের আগাম আবহাওয়া ঘোষণার মানমন্দির এই ছোটো ছোটো কাগজগুলি। শুধু অভিধানগত "ছোটো" শব্দটির অর্থে তাই এর বিপুল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শনাক্ত করা যাবে না। নতুন প্রতিভার আবিষ্কারের একমাত্র অবিসংবাদী মাধ্যমও এই লিটিল ম্যাগাজিনগুলি।

কিন্তু যে হারে কাগজের দাম বাড়ছে, বাড়ছে মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়; যখন নিউজপ্রিন্টের তাজ্জব বর্ধিত মূল্যের কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের দৈনিক-গুলির মৃত্যুসংবাদ আমাদের গোচরে আসছে প্রায়ই, তখন আমাদের এই ত্রৈমাসিক, এই অগ্নি মূল্যের শনিকে এড়িয়ে কতদিন চলতে পারবে, এই মূলক শংকা প্রায়ই আমাদের বিব্রত করে। কাগজওয়ালা, প্রেসওয়ালা, দপ্তরী পয়সা নেবে আর মূল গায়েন লেখকই উপেক্ষিত থাকবে, আমরা তা চাইনি বলেই বিভাবের প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রতিটি লেখককে আমরা সাধ্যমত সম্মানমূল্য দিয়েছি। কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানিক কাগজ বাদ দিলে সেই সম্মানমূল্যের পরিমাণ অনেক দৈনিকপত্রের চেয়ে অনেকসময় নিতান্ত কম হয়নি। তাই এই "ভালবাসার পরিশ্রমে" কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, বড়ো বড়ো কমার্শিয়াল হাউস এবং উচ্চপদে আসীন বন্ধুবান্ধবদের কাছেও হাত পাততে আমাদের বাধেনি। আমাদের কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ছোটো কাগজের জন্য মায়াকান্না মাঝে মাঝেই বড়ো বড়ো কাগজে বেরোয়। কিন্তু কি বিজ্ঞাপনের পরিমাণে, কি কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে, গত বিশ বছরে কেন্দ্রীয়

সরকার তেমন কিছু বাস্তবে করেননি যাতে তাদের অতিবিজ্ঞাপিত উৎসাহ প্রমাণিত হয়। তাছাড়া সরকার যতটুকু বিজ্ঞাপন সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক সাহিত্যপত্রগুলিকে দেন, তার টাকা পাওয়ার আগে অনেক সময় বছরের ক্যালেণ্ডার পাল্টাতে হয়।

যাহোক এই খেদ দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। সাহিত্যপাঠকের কাছে এ-ধরনের ভিতর-খবর স্বাদু নাও ঠেকতে পারে। তবু যদি কোনো অপ্রতিরোধ্য কারণে বিভাব বন্ধ করে দিতে হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রিয় পাঠকরা, যারা গত একযুগ ধরে তাদের অকৃপণ বদান্যতায় আমাদের কৃতার্থ করে রেখেছেন—তারা যেন আমাদের ভুল না বোঝেন, তাই শংকার এই আগাম নিবেদন।

বিভাবের আগামী সংখ্যাই শারদীয় সংখ্যা।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

বিতর্কিত বাঙলা রেনেসাঁস—
ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীরা

নমিতা বসু মজুমদার

রেনেসাঁস বা রেফর্মেশনের ইতিহাস লিখতে বসিনি। আমার নেই সেই প্রভূত-পাণ্ডিত্যময় প্রজ্ঞা। নেই ঐতিহ্যবিস্তারী অজন্তার সমান কোনো ব্যাপক প্রেক্ষাপট; যাতে থরে বিথরে রূপায়িত কাল থেকে কালান্তর, দেশ থেকে দেশান্তরের সমাজ-সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্য থেকেই উত্থিত বিশেষ একটি উজ্জ্বল রূপের রেখা-রঙ-গঠন ত্রিমাত্রিক রূপায়ণ বিবর্তন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। সে কাজে শতাধিক লেখক এসেছেন, আসবেন। আমার আলোচ্য, বিতর্কিত বাঙলা রেনেসাঁসে ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীরা। শিল্পী বলতে, আমি তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছি, যাঁরা শব্দের কারবারী। ধ্বনি থেকে কবিতায় পৌঁছে কবি। কবিতার ছন্দ-মিল, অনুপ্রাস, তীর্যকতা, উক্ত এবং অনুক্ত উক্তির ছুঁয়ে যাওয়া স্বরেলা ব্যঞ্জনাসমূহ থেকে গদ্যের ঋজু, দৃঢ়-বলবান বীর্যময় এবং সরল সহজ স্নিগ্ধ আঙ্গিকে গল্পলেখক, উপন্যাসকার, প্রবন্ধ নির্মাণকারী। প্রবন্ধে নির্মাণ অংশই বেশি প্রতিভাসিত তবু তাতেও সৃজন থাকে জড়িয়ে। থেকেই যায় কবিতার অন্তঃশীলা হৃদ্-স্পন্দনের মতোই বুকের কোটরে। লেখক এসেই যান এমন একটি বিশ্বের মুখোমুখি যেখানে বিশ্বরহস্যের মতোই ক্রম-জায়মান ধ্বনি থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বাক্য। আর সেই বাক্যে শব্দিত —আঁধার-আলো, আশা-নিরাশা, সংগ্রাম-প্রতিরোধ; ন্যায়-অন্যায়-ঈর্ষা-ঘৃণা; বিবেচনা-ত্যাগ। শব্দিত মানুষের ভালোবাসা। শব্দিত মায়াময়ী স্বদেশ। আলোকোজ্জ্বল বিশ্বদেশ।

শুরু করতে গিয়ে পিছু ফিরে সিংহাবলোকনে। বৈদিক ভারত, ব্যাস-বাল্মিকী-কালিদাসের ভারত প্রাচ্যের। ইউরোপের গ্রীস, ইতালীর রেনেসাঁস। প্রায় তিনশ' বছরের যৌবনজলোচ্ছ্বাস ইতালীর। যাকে ইতালী বলেছে—"La Rinascita", ফ্রান্স "Renaissance"; ইংরাজরা "Rebirth", বাঙলায় "নব-জাগরণ"। বাঙলার "নবজাগরণ" ঠিক্ রেনেসাঁস কিনা বহু বিতর্ক পক্ষে-বিপক্ষে। তর্কে বহুদূর যেতে আগ্রহী নই। একথা সকলেরই জানা: স্বাধীন ইতালীর গতিশীল সভ্যতা; যে সভ্যতা বণিকতন্ত্রে বহুদূর অগ্রসর; উইল ডুরাণ্টের মতে

প্রায় ধনতন্ত্রের কাছাকাছি। সেই জীবন্ত-সভ্যতার উপরে একটি মৃত অথচ বহুমনন সমৃদ্ধ, চিন্তায় উজ্জ্বল, রসে নবীন এতই নবীন, বিশ শতকের শেষেও আমরা বিদেশীরাও ফিরে ফিরে ঋণ নিয়ে থাকি। যেহেতু মননের মৃত্যু নেই। আর মনন ও রস একযোগে হরপার্বতীসঙ্গমে পৌরুষ ও নারীত্বে ট্রাডিশনের মধ্যেও মডার্নিটির বীজ বহন করে। দেশজের মধ্যেই বিশ্ববীক্ষাকে।

ইউরোপের এত দেশ থাকতে ইতালীই নবযৌবনে জাগল, রেনেসাঁস প্রথম ঘটল সেখানেই, তার কারণ সারা ইউরোপে ইতালীই সেদিন বেশি নাগরিক। বেশি ব্যবসায়ীক। একমাত্র ফ্রান্সের ল্যাঙ্কার্স ছাড়া। দুঃসাহসের অভিসারীও। পশ্চিম ইউরোপ, ফ্রান্স, গ্রীস, আরব, ইহুদী, মিশরীয়, হিন্দু, এমনকি সুদূর চীনেও বাণিজ্য-সম্পর্ক। একজাতীয় খোলা হাওয়া পালে লাগিয়েছিল ভ্রমণ, আলাপচারী আলোচনায়। সেই খোলা হাওয়ার পালেই লেগেছিল নবগর্ভসঞ্চারী গ্রীক্-সভ্যতার প্রবল হাওয়া।

বাঙলা রেনেসাঁসের ঘটনাটি বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। দেশ স্বাধীন নয়, বণিকতন্ত্র তেমন জাগ্রত হয়নি, সমাজে ব্যাপক রাজতন্ত্রলালিত সামন্ততন্ত্র, সামাজিক ধ্যান-ধারণাও তদনুযায়ী। কারুর মতে সভ্যতাটি একান্তই মৃত, কারুর মতে মৃত না হলেও স্থবির-বৃদ্ধ, বল্মীকে ঢাকা জড়, অনড়, গতিহারা। অবশ্য এমতটিও আছে: আগ্রাসী বিদেশী সামরিক বিজয় দেশের ক্ষতিই করেছে মাত্র। না-হলে সময়ের স্ব-নিয়মেই দেশের অভ্যন্তর থেকেই জাগরণ দেখা দিত বহুব্যাপক, যা বিদেশী শাসন-শোষণে অসম্ভব। কী পেয়েছি, কী পাইনি, কী পাওয়া যেত তার হিসেব কষতে বসলে তর্ক বহুদূরগামী হবে। নিশ্চিত বিদেশী সামরিক আগ্রাসন ক্ষতি করেছে দেশের। ভারতবর্ষে বারবার বাহির থেকে সংগ্রামী আক্রমণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীরা মিলে হয়েছে ভারতবর্ষের অঙ্গস্বরূপ। "শক, হূণদল, পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।" এমন ঔপনিবেশিক প্রভু হয়ে ভারতবর্ষের সম্পদ শোষণ করে নিয়ে যায়নি স্বদেশে। পর্তুগীজ, ফ্রান্স ও ইংরেজের ঔপনিবেশিক কুশলতার প্রতিযোগিতায় ইংরেজই হয়েছিল যোগ্যতম কুশলী। যদিও সম্পদ-শোষণ কী বস্তু, তার মর্মার্থ শেষ পর্যন্ত কোনখানে অগ্রসর হয় তাও জানা ছিল ইংরেজদের। একদা রোমান্ চার্চের অন্তর্ভুক্ত পোপেরা ইংল্যাণ্ডের সম্পদ শোষণ করে তাদের দরিদ্র করে দিয়েছিল। সেই দারিদ্র্যই জাতীয়তাবোধ এনে দিয়েছিল তাদের চরিত্রে। ইংরেজ শাসন এবং শোষণই বোধকরি আমাদের অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল। সম্পদ-শোষণের কাজে

তারা যানবাহনের গতিকে বেগবান করেছে। রেলপথ বিস্তৃত করেছে জালের মতো দেশ জুড়ে। তাতে লোকসানের সঙ্গে লাভও হয়েছে কিছু। গতির প্রাপ্তিকেও পেয়েছি আমরা। আমাদের সমাজ একটু নড়ে চড়ে উঠেছে।

জীবনদর্শনের দিক্ থেকেও খুবই স্পষ্ট পৃথকত্ব। আমাদের প্রাচ্যসভ্যতার মূল সুরটি ছিল অস্মিতার বিলোপ। অহংকে মিলিয়ে দেওয়া সোহং-এ। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রায় একজাতীয়। সোহং এবং নির্বাণ। মুসলিম ধর্ম যতখানি ধার্মিক প্রায় ততখানিই জাগতিক। ভারতে তারাই শুরু করেন লিপিবদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষণ। অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা, কারুর মতে স্থিতধী, কেউ বলেছেন স্থিতাবস্থা, যাতে জড়িয়েছিল অনেক শৈবালদাম। এমন জড়িয়েছিল অস্থির চঞ্চল অভিঘাতের ছিল প্রয়োজন। তাদের দেশে বিদেশী রাজ-পুত্রই বয়ে এনেছিল চঞ্চলতাকে। সঙ্গী বণিকপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র। বাঙলার নবজাগরণে ঘটনাটি ঘটল একটু পরিবর্তিত হয়ে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। মন্ত্রণা, শাসনের সঙ্গে শোষণও সঙ্গী। তবু প্রবল অভিঘাতকে অস্বীকার করা যায় না। চঞ্চলতা জেগেছিল। আপামর জনসাধারণ না জাগলেও তৈরি হয়েছিল একটি নতুন ধারার মধ্যবিত্ত সমাজ। আর রানীবিবি, হরতনী, টেক্কানীদের বুকেও টান লেগেছিল।

ইতালীর রেনেসাঁসে অস্থির চঞ্চলতা। অস্মিতার বিলোপ নয় উচ্চকণ্ঠ-উচ্চারণ উল্লাস—"আমি।" অস্মিতার সঙ্গে যুক্ত গ্রীকসভ্যতার বিজ্ঞানমনস্কতা। মানব-কেন্দ্রিক-চিন্তা মানুষের দৈহিক শৌর্য-সৌন্দর্য-আনন্দ-বেদনাকে জায়গা দেওয়া। আর এইজন্যই উজ্জীবন প্রচেষ্টাতেই ফিরে পড়া ক্লাসিক-সংস্কৃতি। ক্লাসিক সংস্কৃতির পঠনকে গ্রীসে বলা হত "umanisti" তার থেকেই humanist। এঁদের প্রখর বুদ্ধিবাদী চিন্তা Plato-র Diologus-কে গ্রীষ্টীয় New Testament-এর মুখোমুখী রাখে। শতবর্ষ ধরে ইউরোপের বুদ্ধিবাদী জীবন ছিল হিউম্যানিস্টদের দখলে। থিয়োলজী থেকে দর্শন। বিজ্ঞানকে মুক্ত করে মস্ত প্রগতির কাজ করেছিলেন। তবু হায়রে, জীবনবীণা ঠিক সুরে যে বাজে না। প্রগতিতেও ফাঁক পড়ে যায়। গ্রীক সভ্যতা মানুষের মুক্ত মনস্কতা। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দৈহিক শৌর্য-সৌন্দর্যকে স্থান দিয়েছিল। আবার সেই সভ্যতাতেই "slavery justified" এবং প্রায় স্লেভসম নারীরা। গৃহাঙ্গনাদের অধিকার অতি সীমিত। ব্যক্তি-অধিকার-মর্যাদা পেতে হলে বারাঙ্গনা হওয়াই সুবিধের ছিল। গ্রীসে "হেটেরিরাই" স্বাধিকার ভোগ করত। রেনেসাঁসে গ্রীক-জীবনাদর্শ নব-প্রতিষ্ঠা হলেও আমরা গ্রীষ্টের দয়দী

বিপ্লবী ভূমিকাটিকে কোনমতেই বাদ দিতে পারি না। তাঁর দূরপ্রসারী মানব-প্রেমিক দৃষ্টি মানব-সমাজের সম্পূর্ণ রূপান্তর চেয়েছিল। সবার ওপরে মানুষ সত্য, এ যদি হয় রেনেসাঁসের বক্তব্য, খ্রীষ্ট বক্তব্য—সব মানুষই সমান। সকলকে পেতে হবে সম অধিকার। বিশ শতকের অর্থনীতিবিদ্ এরিখ রোলের উক্তি উদ্ধৃত করি—"Christ, addressing Himself to the labourers of His time proclaimed for the first time, the workers both in a material and a spiritual sense of all work." সব মানুষের সম সত্ত্ব। প্রথম এই কথা উচ্চারণের মতই। তাঁর আরো একটি উচ্চারণ যে সময়ে might is right, শক্তিই ন্যায় বাক্যটির কালপ্রবাহ বহে চলেছে। সেই প্রবাহে দাঁড়িয়ে তিনি শব্দ জগতের একটি শব্দ আবিষ্কার করেছিলেন : ভালোবাসো। ভাইকে ভালোবাসো, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, ভালোবাসাই ঈশ্বর। একটি আশ্চর্য উষার অরুণোদয়ে আলোক বিচ্ছুরণে দেখা দিয়েছিল শব্দটি। তবু মনে রাখতে হবে খ্রীষ্টের অমেয় আকাঙ্ক্ষা। অপরিমেয় ভালোবাসা সত্ত্বেও পুরোপুরি বিপ্লবী রূপান্তর ঘটেনি। সাহিত্য, শিল্প, সেবা, ভ্রাতৃত্ববোধ বহুদূরগামী হয়েও হয়নি সর্বত্রগামী। আর্থ-সামাজিক স্তরের অন্যতর বিন্যাসে তাঁর সর্বদহা প্রেমকেও বিদ্ধ হতে হয়েছে। "ফোর্স অব সারকাম্‌স্টানসের" ক্রুশে। রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের উপরেই দাঁড়িয়ে। ডুরান্টের মতে "was of the few, by the few and for them," পোলার্ড মতেও "It requires a middle class and it requires an urban population." যেখানে ব্যবসাভিত্তিক মধ্যবিত্ত সমাজ দেখা দেয়নি সেখানে "you had no Renaissance and no Reformation" এবং আমরা সকলেই জানি, সূক্ষ্ম সুউচ্চ শিখর আর বিরাট সমতলের মাঝামাঝি কয়েকটা ধাপে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্তরা। আপামর জনসাধারণ সেখানে প্রদীপের পাদপীঠের মতই। আলো ছড়ায় না সেই তলদেশে। তৃণমূলের গভীরে পৌঁছবার বাধা সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই।

ইতালীর রেনেসাঁস তরঙ্গকেও পড়তে হল কালের কবলে। তিনশ বছরের অর্জিত গৌরব ভেঙে পড়ল স্পেন ও ফ্রান্সের কাছে সামরিক পরাজয়ে। যেহেতু সংস্কৃতির মধ্যে থেকেই যায় দেশজের অন্তরে বিশ্ববীক্ষার সম্মেলন, গ্রীকসংস্কৃতিতে স্নাত ইতালীর রেনেসাঁস ছড়িয়ে পড়ল অন্যদেশে। সেই দেশজে মিশ্রিত হয়ে নতুন চেহারা হল তার। ফ্রান্সে যে চেহারা হল, ঠিক সেই আকার হল না জার্মানীতে। জার্মানী রেনেসাঁস থেকে ছেঁকে বেছে নিয়েছিল হিউম্যানিজমকে যা তার রেফর্মেশনে

কাজে আসে। ফ্রান্স ধর্মীয় তত্ত্বালোচনায় বিশেষ শক্তি খরচ করেনি। ফরাসীদের অন্তঃশীলা নন্দন-বোধ-উৎসটিকে দোলা দিয়েছিল ইতালীর সেই "দোলচে-স্তিল-নুওভা"। নতুন-মোহন-রীতি। ত্রয়ী প্রাপ্তিকে নিলো ফ্রান্স। হিউম্যানিজমের মানবতাবাদ, পেত্রার্কের স্টাইল আর প্লেটোর দর্শন। তার মোহনরীতি ইতালীকেও ছাড়িয়ে ছাপিয়ে গেল। নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় মানস-মুকুলে।

সামরিক বিজয় ফ্রান্সের দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্পেনই অধীশ্বর হয়ে বসেছিল ইতালীর। কিন্তু একটি অতীব দূরদর্শিতায় অভূতপূর্ব মর্যাদার অধিকারি হল সে। ভেনিসের মুদ্রণ ব্যবসাটি কিনে নিল। ইউরোপে মুদ্রণ যদিও জার্মানীর আবিষ্কার তবু তার মুদ্রণরীতি ছিল দুরূহ। পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষরের হুবহু নকল। কাজেই প্রতিটি পৃথক হস্তাক্ষর নকল করে বই ছাপানো দুর্মূল্য হয়ে পড়ত। হাতে লেখা পুঁথি অপেক্ষাও দাম বেশি হত তার। মুদ্রণ-জগতে যিনি চিরস্মরণীয় তাঁর নাম Aldus Manutius, ভেনিসের মানুষটি হস্তাক্ষরের অত্যাচারের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহার করলেন Italic types, অক্ষর জগতে বিপ্লব ঘটে গেল। হতে থাকল নতুন নতুন বইয়ের আবির্ভাব। লাতিন ক্লাসিক; গ্রীসের অমূল্য গ্রন্থরাজী। দেশজ ভাষারো যা সিদ্ধিশ্রেষ্ঠ (masterpiece)।

বইয়ের জগতটিকে প্রসারিত করবার গরজ ফ্রান্সকে এতই মোহিত করেছিল সম্রাট দ্বাদশ লুই মুদ্রণ জগতের গুরু করভার লুপ্ত করে দিলেন। প্রায় কর শূন্য করে দিয়ে। কিন্তু, লেখক, বুদ্ধিজীবী এলিটদের বন্ধুসম হয়ে উঠলেন ফ্রাসোঁয়া প্রথম (Francois I) আর তাঁর বৈদগ্ধময়ী বোন নাভায়ের রানী (Marguerite) মার্গরিতে। তাঁর সহযোগিতার হাত সবসময়ই থাকত বাড়ানো। নিজে বিদুষী, চিন্তাশীল তো বটেই, কবিও ছিলেন। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সমালোচক অভিমত : বিশেষ মনন এবং জীবনের নানা অনুভব-অভিজ্ঞতায় হৃদয়-সংবেদ্য হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় ঘাটতি ছিল তাঁর। কবিতার অশ্রুতসরটিকে তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। অর্থাৎ ঠিক বাঁশি বাজেনি। সেতারের সব তার বাঁধা হয়েও বেজে ওঠেনি সুরঝঙ্কার। পরবর্তী যুগ তাঁকে Heptaméron-এর রচয়িতা বলেই জেনেছে সত্তরটি গল্পগুচ্ছ। যা বোকাচ্চিওর ডেকামেরনকে স্মরণ করায়। ফ্রান্স রেনেসাঁসের মোহনরীতির উপর নিজের সাহিত্যরুচি ন্যস্ত রেখেছিল বলেই পেয়েছিল Rabeliais (রাবলে), Montaigne মন্তেনকে। বক্তব্যের নির্মাণ অঙ্গের সঙ্গে সৃজনের সিদ্ধি, মানস ইউরোপীয় ছাড়াও অন্যমানসকে নন্দিত করেছে।

আগেই বলেছি : জার্মানী রেনেসাঁস থেকে ছেঁকে বেছে নিয়েছিল যা তার

রেফর্মেশনকে দামী করে তোলে। বিদ্বৎ সমাজের পাণ্ডিত্যকেই বেশি দাম দিয়েছিল "দোলচে স্তিল নুওভা" নতুন-মোহন-রীতি অপেক্ষা। পঞ্চদশ শতকে Humanism জার্মানী ছেয়ে যায়। চার্চের অভিভাবকীভঙ্গি থেকে দর্শন, বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে মুক্ত করাই ছিল তাঁদের অভীপ্সা। সেদিক থেকে তাঁরা লাতিনেই গ্রন্থরচনা সমর্থন করেছেন—যাতে করে বৃহত্তর পণ্ডিতসমাজের সমর্থন পেতে পারে। যেমন আমরা ভারতবাসীরাও একদা আঞ্চলিক ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার ওপর জোর দিয়েছি এই ভাবনাতেই। যদিও রেফর্মেশনের প্রধান অধিকারী মার্টিন লুথার দেশজ ভাষার ভাবনা ভেবেছিলেন ফরাসী মানসের মতো নান্দনিক অনুভবী না হয়েও দেশবাসীর কথা ভেবেই। লুথার বাইবেল অনুবাদ করেন গ্রীক ভাষা থেকে জার্মান ভাষায়, তাঁর কারাগার বাস কালে। মার্টিন লুথার ঠিক হিউমানিস্ট ছিলেন না। খৃষ্ট-বিরোধী নন; খৃষ্ট-বিশ্বাসী। পোপতন্ত্রের অনাচারের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রতিবাদ আন্দোলন। রেফর্মেশন আসলে সেদিনের ক্যাথলিক পোপতন্ত্রের অনাচারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লুথার চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ পোপ-মুখ থেকে খ্রীষ্টকে না চিনে এই দরদী, মরমী বইখানির মারফত তাঁকে চিনুক। সাধারণের প্রতি দরদ যথার্থ ছিল, চতুরালি ছিল না। কৃষক-দরদী মানুষটির বারো দফা বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি উদ্‌ধৃত করি :—

১. পুরো সমাজের অধিকার থাকুক পুরোহিত নির্বাচনে।
২. পৌরোহিত্যে অনধিকারী মনে হলে বর্জন অধিকারও থাকবে।
৩. খৃষ্ট মানুষের মঙ্গলের জন্যই আপনার পবিত্র রক্ত ক্ষরণ করেন, সেই রক্তস্নাততাকে আদর্শ মনে করে যেন প্রতিবেশীদের ভাইদের দুঃস্থদের ভালোবাসি।
৪. দরিদ্রের সম্মুখে বন্ধদুয়ার। বহমান জলেও তাদের মাছ ধরবার অধিকার নেই। ঈশ্বরের অনুশাসন এমন স্বার্থ প্রযুক্ত হতে পারে না।
৫. অরণ্যভূমি ধনী অধিকারে, তা এবার সর্বসাধারণের সম্পত্তি হোক্।
৬. চাষী মজুরদের যথার্থ পারিশ্রমিক দেওয়া হোক্।

ষোলো থেকে এগিয়ে আঠারো শতক। জার্মানীর ইন্‌টেলিজেনৎসিয়া বুদ্ধিবাদী কার্যকরণ দর্শনদ্বারাই অধ্যুষিত ছিল তখন। সমস্ত ডগ্‌মার শৈবালদাম ছিন্ন করে স্ব-সত্তার সত্যান্বেষণেই শক্তি খরচ করে চলেছিল, সেখানে তাঁরা কোনরকম চার্চেরই অধিকার স্বীকার করেননি। Philosophy of Enlightment শিখরে ওঠে Kant এবং Lessing-এর অগাধ মননে। এর প্রতিবাদী চিন্তাও শুরু হয় আঠারো

শতকের শেষ দিকেই। তার বক্তব্য : বুদ্ধিসর্বস্বতাই সমস্ত নয়। সাহিত্য ব্যক্তি-মানসের সৃজন এবং প্রতিভাবান লেখক কোনো বিধি-নিষেধের বেড়ার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে রাজী হন না কোনকালেই। স্বখাত খনন করাই তাঁর কাজ। যদিও দেশজ ঐতিহ্য, বিশ্বসম্পদের অনেক কিছুই তাঁকে নাড়া দেয়। গ্রহণ-বর্জনেই ভাস্বর হয়ে ওঠেন প্রজ্ঞাবান লেখক। এই চিন্তাধারার নাম ছিল Sturm und Dräng (Storm and Stress), শিলার এবং গ্যোয়েটে শুরু করেছিলেন Storm and Stress-এর ধারাতেই। কিন্তু, বাহির হয়ে যান। ঝরনা যেমন প্রবল বেগে বাহির হয়ে ধারায় ধারায় মিলিত হয়ে হয়ে ওঠে বেগবতী স্রোতস্বিনী; গ্যোয়েটের প্রতিভাও তেমনি জার্মান সাহিত্য এলাকা পার হয়ে ইংরাজী, ফরাসী, ইতালীয় "দোলচে স্তিল নুওভা" পরিক্রমা করেই। একদা ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্য সাহিত্যেও দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর অনুশীলনী চিন্তা জাতীয়-সাহিত্যকে লক্ষ্মণকৃত গণ্ডীতে আবদ্ধ সীতার মতো রাখতে চায়নি। যা সহজেই রাবণের কবলে পড়তে পারে। তিনি চেয়েছিলেন একটি আদর্শ বিশ্ববীক্ষা রবীন্দ্রনাথের মতই শুভবাদী; তবু আদর্শই। জীবনমাপনে যখন জীবনজিজ্ঞাসার সব উত্তরগুলি মেলে না, তখনি ট্র্যাজেডি ঘটে। এই ট্র্যাজিডির মর্মান্তিক বেদনা বোধকরি সমস্ত সৎ জীবনজিজ্ঞাসুর জীবনেই ঘটে থাকে। যেহেতু বিশ্বের অনেক দেশই অজানা কয়েকটি সমসত্ত্ব দেশ ছাড়া—যেহেতু সমতার চারা ছড়ায়নি সর্ব মানুষের মধ্যে; তাদের দারিদ্র্য, অক্ষমতা, অসার্থকতার, নন্দন-অনুভবী সাধসমূহ সাধ্যের অতিরিক্ত হয়ে বেদনবিদ্ধ, ব্যর্থতায় রিক্ত। তা প্রতিভাবানকেও রিক্ত করে তোলে। যা হতে পারত, তা হয় না।

সকলেই নয়, তবু আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি আবিশ্ববীক্ষার আলোকিত আকাশকে। বিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে মৃদু পদসঞ্চরণ শুরু হয়েছে। আমরা ইউরোপ ছাড়াও অন্য দেশের প্রতি হৃদয় মেলে ধরছি। লাতিন আমেরিকা, কৃষ্ণ আফ্রিকাও আজ আমাদের আঙিনায়। তবু তা ঊষার অরুণোদয় মাত্র। অবন ঠাকুরের রঙের মতোই নরম। বলা ভালো, চিত্রী রবীন্দ্রের মতো উজ্জ্বল, সতেজ লাল, কালো, গাঢ় সবুজ, বেগুনীর সম্মেলনে গতিশীল, বেগবান নয়। আশা করব, এক ভবিষ্যতে বিশ্ব-আকাশ দ্বিপ্রহরের সূর্যে স্নাত হবে। শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ আমরা সমস্ত খণ্ডতা পেরিয়ে অখণ্ড রৌদ্রকরোজ্জ্বলে ভৈরব-আনন্দে নন্দিত হবো। আমি আশাবাদী, তবু এতবড় মূর্খ নই যে ভেবে বসব, এমন সমগ্রপ্লাবী পাওনা, করতলগত আমলকীবৎ সহজসাধ্য। বহু আয়োজন, বহু হৃদয়সংযোগ, বহু

ওঠাপড়া পার হতে হবে। প্রায় "অসম্ভবের পায়ে মাথা কোটার" মতোই। আমার বিশ্বাস ন্যস্ত অসম্ভবেই। যদিও জানি, সংস্কৃতির শেকড় প্রোথিত মাটির গভীরেই। দেশজ রসেই সে নানা খানা। তার আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-হারানো, প্রাণের ভাষা, জীবনভঙ্গিমা। কিন্তু, ধারায় ধারায় যে বর্ষণ নামে মেঘের : সেই মেঘেরা নীল, ঘননীল, কৃষ্ণ, ঘনকৃষ্ণ, গভিনীর স্তনবৃন্তঘেরা তাম্রাভ মেঘেরা ডানা মেলে ছুটে আসে সময় ডিঙিয়ে। দেশান্তর সীমানার তোয়াক্কা না রেখে। কোনো ভিসা, পাসপোর্টকে খাতির করে না। একান্তই মাটিকে মানলে এথনিক আকাঙ্ক্ষা সর্বগ্রাসী হয়ে বিচ্ছিন্নতাকে আশ্রয় করে। খণ্ড দেশ, খণ্ড ভাষা, খণ্ড ধর্ম, খণ্ড গোষ্ঠী প্রবল হয়ে মানুষের হৃদয়-সংযোজন চরিত্রটিকেই প্রতিহত করে। আমার বক্তব্য দরদী স্পেনীয় কবির বক্তব্যের সমতা : "শেকড়ের ডানা হোক্, ডানারা শেকড়।" আমার খণ্ডগুলি উঠে যাক অখণ্ডের আকাশে, আর অখণ্ড প্রবেশ করুক আমার খণ্ড অভ্যন্তরে। অংশ এবং বৃহত্বে মিলে আমরা সহস্র হই।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দু'টি ধারাই গ্রহণযোগ্য মনে করি। সেই চরিত্রই ততখানি সার্থক যিনি দ্বিধারার (tradition ও modernity) একটিকেও বর্জন করেন না। মাত্র তাই নয়, সমান্তরালও রাখেন না। দুটি রেখার সমন্বয়ে একটি আশ্চর্য কোণের সৃজন করেন। যেমন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঐতিহ্যের অদৃশ্যপ্রায় বহমানতা একটুও না থাকলে বহির্বিশ্বের আঘাত কোনো স্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না, আবার সময় থেকে সময়ান্তরে বহির্বিশ্বের অভিঘাত না পৌঁছলে জলে ঢেউ লাগে না, সে স্থির জড় হয়ে প'ড়ে। মানুষের পরিধি ক্রম বিস্তৃত হচ্ছে। গোষ্ঠী, গ্রাম, অঙ্গরাজ্য, রাজ্য, নেশন, আন্তর্জাতিক বিশ্ব। আজ পৃথিবীর চেহারা যাই থাক : কোনো একদিন সমস্ত পৃথিবী মুখোমুখী দাঁড়াবে। রণক্ষেত্রে নয়। যথার্থ মানবের সর্বংসহা প্রেমে; বুদ্ধি যুক্তির নির্মল আলোকে। শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস রাখব। হয়তো এ বিশ্বাস কবির। তবু মনে করি, সব ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ্‌ও তাই চান। সৎ মানুষই ভেতরে ভেতরে লালন করেন কবির অভিপ্সা।

আমাদের বাঙলা সংস্কৃতির মধ্যে যদি গ্রহণধর্মীতার উৎস উৎসারিত না থাকত তাহলে বিদেশী ইংরেজ আরো বিদেশিনী ইতালীর রেনেসাঁসের অভিধা বহন করে এনে কোনো তরঙ্গই তুলতে পারত না। আমরা আগেই দেখেছি রেনেসাঁসও অন্য দেশজে মিশ্রিত হয়ে হয় অন্যরূপা। যা ইতালীর তার হুবহু অনুকরণ ফ্রান্সের নয়। জার্মানীর চেহারা অন্য, ইংলণ্ড অন্যরূপ। যদিও কিছু বিশেষত্ব প্রায় সমগ্র প্রতীচী জুড়ে।

রেনেসাঁস, রেফর্মেশন অবলোকনে দেখলাম কয়েকটি স্পষ্ট ধারা :

১. প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির পুনঃমূল্যায়নে তার দার্ঢ্যতা ও দর্শন-বিজ্ঞানের মুক্ত-মনস্কতা গ্রহণ।

২. হাজার বছরের বেশী সময় ধরে বহমান খৃষ্টধর্ম। যার প্রথম ও শেষকথা —ভালোবাসাই ঈশ্বর। দীনতম দীনের কুটিরেও আছেন ঈশ্বর। যদিও জড়িয়ে গিয়েছিল অনেক অলৌকিক ভাবনা (miracles), প্রেমিক খৃষ্টের সঙ্গে। বাস্তবের সঙ্গে পরাবাস্তব। তাই যায়—অসাধারণকে সাধারণ বাস্তবের মধ্যে রূপায়িত করতে তখনো শেখেনি মানুষ। যুগন্ধরকে যুগোত্তীর্ণ করতে গিয়ে অতিকথার আশ্রয় নেয়। আসলে তার অভীপ্সা মহত্ত্বের রূপদান। খৃষ্টের মহত্ত্ব কত যে নাড়া দিয়েছে ইউরোপীয় মানসকে! তলস্তয় ছাড়াও আনাতোলে ফ্রাঁন্সের উপন্যাস 'থেইস', গ্রীক ঔপন্যাসিক নাইবাস কাজানটাকিসের 'ক্রাইষ্ট রিক্রুশিফায়েড', সুইডিশ সাহিত্যিক পারলাগেকভিস্টের 'বারাব্বাস'। তিনটি উপন্যাসই তিন ভিন্ন কোণ থেকে দেখা।

৩. অলৌকিক ভাবনা থেকে অগ্রসর হলেন ইতালী রেনেসাঁসের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। গ্রীসিয় দার্ঢ্যতা আর খৃষ্টীয় মাধুরীকে দিলেন মিশিয়ে। কঠিনে-কোমলে, প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন খৃষ্টকে। সাধারণের মধ্যেই অসাধারণকে।

৪. চার্চের মধ্যে ধীর গোপন প্রবেশ ঘটতে থাকল সম্পদ এবং শক্তির। ক্রমেই খৃষ্ট ব্যবহৃত হলেন। খৃষ্ট এবং ঈশ্বর-প্রেমকে ছাপিয়ে সম্পদ, দম্ভ, মদমত্ততা, কুটিল চতুরালির অমানবিক চেহারায়—বহুমানুষের আন্দোলন শুরু হল ন্যায়ের পক্ষে। দৈত্যের হাতে নয়, চার্চ আসুক ঈশ্বরের হাতে।

৫. হিউম্যানিস্টদের বুদ্ধিবাদী আন্দোলন কোনো চার্চীয় অভিভাবকত্ব মানতে রাজী হয়নি। প্রায় শতবর্ষ ইউরোপের নানা দেশের এলিট সম্প্রদায় এই আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েছেন। বুদ্ধির প্রসারতা ঘটেছে। কিন্তু, সর্বপ্লাবী হয়নি যেহেতু তাঁদের দেশজ ভাষায় রচনা হতো না, হতো লাতিনে। সীমিত সংখ্যকেই আবদ্ধ। অতঃপর দেশজ ভাষার প্রতি নিবদ্ধ হলো লক্ষ্য।

২

ইংলণ্ডে রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল নিজের চেহারায়। প্রায় সবদেশ থেকে গ্রহণ বর্জনে অন্যতর। অতুলনীয়া। হিউম্যানিস্ট প্রভাবে চিন্তাধারা মুক্ত-স্বচ্ছ। ভাগ্যবাদ,

নিয়তিশরণকে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার হানা, প্রাতিস্বিকতায় কখনো কখনো ভাস্বর। যেন খাপ খোলা তলোয়ার, ধারালো, শানানো। তার বিদ্রোহী চেহারাটি পোপতন্ত্রের খবরদারীর বিরুদ্ধে। তাছাড়াও তার সমস্ত সত্তায় জড়িয়ে গিয়েছিল স্বাজাত্যবোধের (patriotisim) ব্যাকুলতা, যা প্রায় প্যাসন। জন উইক্লিফ, ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে সে সংহত হতে চেয়েছে। মাত্র এই কঠিনকে দেখলে রেনেসাঁস না বলে রেফর্মেশন বলাই সঙ্গত। রেনেসাঁস অভীপ্সা : জীবনের সবক্ষেত্রে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা। ইংল্যাণ্ড অভীপ্সা : সংহত নেশন হয়ে গড়ে ওঠা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আকাশ-বিশ্বের অভাবিত সব তত্ত্বপ্রকাশে সৌন্দর্য-রহস্যে মুগ্ধ হয়েছিল সে যতখানি, ততখানি হয়েছিল বিশ্বতথ্যের অন্বেষণে। তবু এই কঠিনেও এসে মিশেছিল রেনেসাঁস মাধুরী। পরবর্তী সময়ে পেত্রার্ক, রাবলে, মন্তেনকে আকুল-আগ্রহে অনুশীলন করেছে। শেকস্‌পীয়রের সনেটগুলিতে ভাস্বর পেত্রার্কই। সাহিত্যের নন্দন অনুভবকে ইতালী থেকে, ফ্রান্স থেকে নিয়ে যতখানি বোধায়িত করে তুলেছে আপন বোধের মধ্যে, প্রায় ততখানিই বর্জন করেছে চিত্র ও ভাস্কর্যকে। ইতালীর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো প্রভাব ফেলেনি সে সময়ে। তখন তার চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত একজাতীয় পিউরিটান সেরিয়াসনেস।

হয়তো এই প্রবল রেফর্মেশনে-নম্র রেনেসাঁস মেলা, কঠিন-কঠোর, কোমল অথচ এলায়িত উজ্জ্বল নয়। এই চেহারাটিই মুগ্ধ করেছিল আমাদের বিতর্কিত যুগের মননশীল মণ্ডলীকে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর Literature of Bengal-তে বলেছেন : "The British conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature, and profited by it." হিন্দু ইন্‌টেলেকট কথাটি আমাদের ভাবায়। কোনো মননশীল মুসলমানের রচনা থেকেই উদ্‌ধৃতি দেওয়া সঙ্গত মনে করি। কাজী আবদুল ওদুজ তাঁর বিশ্বভারতী বক্তৃতা-মালার চতুর্থ বক্তৃতায় বলছেন—"হিন্দু এবং মুসলমান দুজনের মধ্যেই ধারণা হয়েছিল—এই জাগরণ হিন্দু-সমাজের ব্যাপার"। প্রথমত, রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন প্রচলিত হিন্দুধর্মের বড়ো রকমের সংস্কার। আর ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে হিন্দুরাই আগ্রহে এগিয়ে যান। কাজী ওদুদ কিন্তু এমন কথা বলেন না যে, প্রথমদিকে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ রচনায় ইংরেজ উদ্‌গ্রীব ছিল।

আসলে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে মুসলমানরা আগ্রহ দেখাননি। বরং বিতৃষ্ণাই। তার কারণ মুসলমান সমাজের পদস্থেরা ছিলেন জমিদার ও উচ্চ রাজকর্মচারী। হিন্দুসমাজের কিছু সংখ্যক জমিদার হলেও বেশির ভাগই ছিলেন ব্যবসায়ী। কাজেই ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা স্বাভাবিক। তাছাড়া আচারে হিন্দু অনুদার হলেও পরধর্মমত সহিষ্ণু। মুসলমান আচারে যথেষ্ট উদার হয়েও ধর্মমতে বেশি গোঁড়া। বিধর্মীর শিক্ষা সংস্কৃতিতে অনুরাগ আসা সহজ ছিল না।

সম্ভাব্য প্রশ্ন, ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইংরেজ সমাগম হয়েছিল, কেন বাঙলাতেই দেখা দিল এই বিতর্কিত রেনেসাঁস? নিশ্চিত একটা প্রস্তুতি পর্ব ছিল বাঙলায়। আগেই বলেছি, সভ্যতা-সংস্কৃতির চিরবহমান স্রোতে মাঝে মাঝে ঢেউ ওঠে উথলে। তার তরঙ্গ অনেক সময়ই এক দেশ থেকে অন্য দেশ প্লাবিত করে। যেহেতু—"Man is a creature capable of so transcending his own limitations of sense and of subjectivity as to gain over more knowledge about his world and about himself in that world. (The Mature Mind—H. A. Overstreet)". সেহেতু আপনার পরিবর্তনে ফিরে ফিরেই আগ্রহী। এমন হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে পঞ্চম পর্যন্ত। ভারতবর্ষ, চীন তো বটেই গ্রীসও প্লাবিত হয়েছিল এই তরঙ্গে। "From Athens to the pacific, the human mind was astir." কাজী ওদুদের মতে "এই জাতীয় জাগরণ ঘটেছিল ফেরদৌসীর পর ইরানে। পাঠান রাজত্বের শেষের দিকে ভারতে চিন্তার ক্ষেত্রে, সমাজজীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল, রেনেসাঁস প্রায়। তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁস একালের ইতিহাসে অনেক প্রভাব ফেলেছে।" ইউরোপের রেনেসাঁস যখন এসে পৌঁছল বাঙলায় তখন ইউরোপের এমন সময় যার নাম হয়েছিল White head : The century of genius. ষোলো শতক থেকে সতেরো শতক। বেকনের Advancement of learning আর সার-ভাঁতের (Cervante's Done Quixote were published in the same year 1605). তার আগের বছরেই প্রকাশিত Hamlet। আশ্চর্য লাগে, শেকস্‌পীয়র আর সারভাঁতের মৃত্যু ঘটে একই সালের, একই মাসের, একই দিনে। সেই বেদনাদায়ক ক্ষতির দিনটি ছিল ২৩ এপ্রিল, ১৬১৬। তবুও শেষ কথা নয়। শেকস্‌পীয়র, সারভাঁতে, বেকন, হার্ভে, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, দেকার্তে, পাস্কাল, নিউটন, লক্, স্পিনোজা, লিবনিজ, এরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি আকাশের এক আশ্চর্য নক্ষত্রমণ্ডলী।

রমেশচন্দ্র দত্তের "and profited by it" বাক্যাংশটি থেকেই ধরি। ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারায় বাঙালি লাভবান হতে পেরেছিল, তার কারণ নিহিত ছিল তার অন্তর চেতনায়। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে বাহির থেকে আসা সব আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য বিনষ্টি। আর্য-আক্রমক ইন্দ্রও বাদ যাননি। তাঁর কাজই ছিল বিজিত নগরীকে ধ্বংস করা। ফলে সম্মানী উপাধি : পুরন্দর। পুরম্-দর অর্থাৎ পুরধ্বংসকারী। স্থিত হলে অভিজ্ঞতা শেখায়; সহাবস্থান, সহযোগ। বাঙলায় পাঠান ইলিয়াসশাহী শাসনের পত্তন হয় চতুর্দশ শতকে। পরবর্তী পাঠান শাসকেরা দ্বিতীয় নীতির অনুসরণে বাঙলার ঐতিহ্যকে গ্রাহ্য করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁদের আশ্রয় এবং সম্মানে সম্মানিত হন। তা ছাড়াও দিল্লির শাসন কর্তৃত্ব থেকে বাঙলা ছিল দূরে। অর্থবণ্টনে অনেক পার্থক্য ছিল না। একজাতীয় সহজ সমঝোতায় জীবনধারা বহে চলত। হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই মাতৃভাষা বাঙলাভাষা হওয়ায় প্রায় national institution সম গড়ে উঠছিল। মোগল শাসনে বাঙলা সর্বভারতীয় আর্থিক কাঠামোয় যুক্ত হল। শুভ হ'তে পারত, কিন্তু হয়নি। ভারসমতাহীন, বিলাসী মোগলশাহীর সংযোগে আর্থিক অসাম্য ঘটল প্রচুর। ঢাকা, রাজমহলে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হল। বাণিজ্য-ব্যবসায় হিন্দু বাঙালিরা প্রচুর বৈভবশালী হলেন। আপামর জনসাধারণ সে সম্পদের ফলভোগী হয়নি। নগরবাসী বণিক সম্প্রদায়ের কয়েকজন উচ্চবিত্তই তার স্তম্ভস্বরূপ। গ্রামসমাজ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতেই থাকল, আর জেগে উঠতে লাগল বিত্তবানদের নতুন নতুন নগরী।

চিরকালই দেখা গিয়েছে অধিক বিত্তের একটা বিনষ্টিকরণ ক্ষমতা থাকে। বিশেষত যখন তৃণমূল পর্যায়ে থাকে দারিদ্র্য। হিন্দু সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি আগেও ছিল। কৌলীন্যে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের ফলে বালবিধবা, কুলীন কন্যার অবিবাহিত অবস্থা, বেশীর ভাগই দুর্দশা বহনকারীরা ছিলেন নারীই। পুরুষের চরিত্র নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু, বিলাসী মোগল সংস্পর্শে পুরুষের চরিত্রহীনতা, মেয়েদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি সম্ভ্রম ও আভিজাত্যের পরিচায়ক হয়ে উঠল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে মোগলযুগের এই বিনষ্টির দিকটিকে বেশি করে দেখিয়েছেন। ভাষার দিক থেকেও মোগলযুগে ফারসী ভাষা চর্চা, সাহিত্য চর্চার মাধ্যম হয়ে দেখা দেওয়ায় সাহিত্য চলে যায় উচ্চশ্রেণীর বিত্তবানের অধিকারে। এই বিনষ্টির জীবনযন্ত্রণার মধ্যে নবযুগের চেতনার জন্য একটা বিক্ষোভ নিশ্চিত সঞ্চিত হচ্ছিল।

৩

সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা, তিনখানি গ্রাম নিয়ে তিনশ' বছরের কলকাতা শহর। সংস্কৃতি বলতে পূর্ব সঞ্চয় কিছুই ছিল না। বাঙলা সংস্কৃতি বিস্তৃত ছিল নদীয়া, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ জুড়ে। চাণক্য শ্লোকটি বোধকরি তখনো কিঞ্চিৎ অর্থবহ ছিল। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।" শ্রীচৈতন্যে রূপান্তরিত হবার আগে নিমাই পণ্ডিতের (শ্রীগৌরাঙ্গ) নৈয়ায়িক এবং টোলের বিশিষ্ট অধ্যাপক রূপে সমাদর ছিল সর্বত্র। বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যা অপেক্ষাও কুল কৌলিক। রাজাকে সম্মানিত করেই সম্মান আদায় করতেন। ব্রাহ্মণেরই অধিকার সংস্কৃত চর্চার। অব্রাহ্মণ ফারসী চর্চা করতে পারতেন, সংস্কৃত নয়। জোব চার্নকের কলকাতা পর্বে শ্লোকটির অর্থ পুরোপুরি বদলে গেছে। "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই।" কুলকৌলীন্যের বদলে এসেছে বিত্তকৌলীন্য, বিদ্যাকৌলীন্য। ব্যবসায়ে প্রধানত, বিদ্যাচর্চার ফলে চাকরি দ্বিতীয়ত। এই নতুন যুগে এনটারপ্রাইজিং ব্যক্তিমানবের চেহারা কুলমর্যাদার গোষ্ঠীচেহারা অপেক্ষা দামি হয়ে উঠল। কালের বিচারে বাঙলা গদ্যের প্রথম লেখক রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)। প্রথম বই "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"। আমি তাঁকে লেখক হিসেবে এখানে উপস্থিত করছি না। তাঁর রচনা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যই বেশি। যতখানি ফারসী জানতেন, সংস্কৃত ঠিক ততখানি নয়। ভালো বাঙলা হয়নি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে বিচারে। আমার বক্তব্য : অব্রাহ্মণ এই মানুষটির কিছু কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জানাও অসম্ভব-প্রায়, এবং ইংরেজ সংস্পর্শে অশিক্ষিত পটুত্বে ইংরাজী জানাও এন্টারপ্রাইজিং ইনডিভিডুয়ালিটিকেই বোঝায়। রেনেসাঁসের যা একটি প্রধান লক্ষণ : প্রাতিস্বিকতা। ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা কলকাতায়, পণ্ডিত রামরাম বসু সেখানে চাকরি পান। শুধু বিদ্যাচর্চার স্থানই বদল হলো না। ব্যবসায়ের স্থানগুলিও বদলে গেল। বিনয় ঘোষের মতে : মধ্যযুগের সূর্য অস্ত গেল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে। বর্ধিষ্ণু তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রাম, হুগলী অস্তমিত। নতুন যুগের সূর্যোদয় হল পূর্বতীর কলকাতায়। শুধু বন্দর কলকাতা নয়—ভাঙতে লাগল পূর্বতন নগরগুলি—ঢাকা, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, আর গড়ে উঠতে লাগল নতুন যুগের নতুন শহর : কলকাতা মহানগর। বিনয় ঘোষ কলকাতার সংজ্ঞা দিলেন : 'জ্যোতির কনকপদ্ম'। নিশ্চিত এই জ্যোতি নবযুগের বিদ্যাচর্চার জন্য যতখানি, কনকপ্রভাও কিছু কম ছিলনা। হিন্দু বণিকেরা সহজেই ইংরাজ বণিকের সহযোগী হয়ে ধনসঞ্চয় করতে লাগলেন। একথা স্বীকার্য বাঙলার

বিতর্কিত রেনেসাঁস শেষ পর্যন্ত হিন্দুবুদ্ধিজীবী এবং বিত্তবানদের জাগরণ হয়েই দেখা দিয়েছে। সমস্ত জাগরণই হিন্দু-ঐতিহ্যবাহী হয়ে দেখা দিয়েছে অবশ্য কিছু মিশ্রণ ঘটেছিল খৃষ্টধর্মের। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে সমস্ত বাহুবলের পাশাপাশিই থাকে বিদ্যাবল এবং ধর্মও। ইংরেজরা যেমন সহযোগী করে নিয়ে এলেন মিশনারী পাদরীদের তেমনি এনেছিলেন মুসলমানেরা সুফীদের। হীরালাল চোপরার মতে: "Who lived a simple life and were intoxicated with Truth". তাছাড়াও অন্যতম অভিধা:

1. It represents the esoteric doctrine of Prophet Mohammed.
2. It was due to neo-Platonist influence. Plotinus himself is stated to have visited Iran with seven neo-platonist philosophers.
3. It has an independent origin. Because sufism meets the requirements and satisfies the cravings of a certain class of minds, existing in all ages.

ভারতে বাস কালে তাঁরা বেদান্তে আকৃষ্ট হন। জালালুদ্দীন রুমি এঁদের প্রধানতম। সুফীদের প্রধান দুটি প্রশ্ন আমাদের কবীর-দোঁহা স্মরণ করায়। মানুষ তার নিজের মধ্যেই কী করে ঈশ্বরকে জানবে এবং ব্যক্তি এবং সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্ক কী?

পাঞ্জাব আর সিন্ধুদেশেই প্রথমদিকে সুফীধর্ম প্রভাব ফেলে। পরবর্তী যুগে, দারাশুকো, আবুল ফজল, ফৈজী বেদান্ত ও সুফীবাদের মিশ্রণে সহায়তা করেন। জালালুদ্দীন রুমির একটি রচনা দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

If he makes of me a cup, a cup am I.
If he makes of me a dagger, a dagger I,
If he makes me a fountain, I pons forth water.

ইংরেজ শাসকরা, মিশনারী পাদরীরাও হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে সমঝোতা করেই কাজে অগ্রসর হন। পণ্ডিত রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়াম বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি পান, তার প্রধান কারণ সে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইংরেজ। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসন্তান ছাড়া পড়বার বা পড়াবার অধিকার ছিল না। এই কুলগত দুর্গপ্রাকারে প্রথম আঘাত হানলেন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ঈশ্বরচন্দ্র। আমার মনে হয় হিউম্যানিস্ট অভিধায় রাজা রামমোহন অপেক্ষাও অগ্রগামী ঈশ্বরচন্দ্র। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী

অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন মতে—"The concept of a humanist knowledge concerned with truths applicable to humanity in general, with an ethical system based upon personal virtues (i.e. the ability gained by an individual's own endeavour), implies the negation of all privileges based upon birth and Estate; it implies the negation of the belief in supranatural powers which had been taught by the clergy...এই উদ্‌ধৃতিটি যেন বিদ্যাসাগরেরই মূল্যায়ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব, আপনচরিত্র বলে মহীয়ান। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলেছেন—(যাঁহার চরিত আছে তাঁহারই জীবনচরিত লেখা যায়), ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরুচ্চর—মাত্র মানবিকতাই মূলধন। সেই মূলধনরক্ষণেই বিদ্যার্জন ও ধনার্জন।

বাঙলা রেনেসাঁসের প্রধান ত্রয়ীর প্রথমতম রাজা রামমোহন। আমার তাঁকে মনে হয়েছে রেফর্মেশন ও হিউম্যানিজমে মেশা। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরুচ্চার নন, একেশ্বরবাদের প্রচারক। তিনিও ব্রাহ্মণবংশোদ্ভবই—মধ্যযুগের অন্ত থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন নবযুগের প্রথম পুরোধা রূপে। জন্ম হুগলীর গ্রামে, মৃত্যু ইংল্যাণ্ডের ব্রিষ্টল শহরে—অভিনব জীবন রচনার অধিকারি এই প্রতিভাধর মানুষটি যদিও বিদ্যাসাগরের মতো দরিদ্র ছিলেন না, ধনীও নয়, সাধারণ সম্পত্তিবান গৃহে তাঁর পটভূমিটি ব্যাপক ছিল, পেয়েছিলেন কিছু। নিজে তৈরী করে নিয়েছিলেন স্ব-অধিকার বলে। শিশুকালে পাঠশালায় বাঙলা, শুভঙ্করীর সঙ্গে ফার্সী ভাষাও শেখেন। বাবা ছিলেন বিষয়ী মানুষ—তিনি চান রামমোহন রাজভাষায় দক্ষতা অর্জন করুন। তিনি পাটনায় যান ফারসী ও আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ হ'তে। কাজী আবদুল ওদুদের মতে: মূল কোরান পাঠই তাঁকে একেশ্বরবাদে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু, তাঁর আত্মীয়তা স্থাপন বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার রচনা প্রমাণ করে, সংস্কৃতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এবং উপনিষদ—সেই এককেই স্বীকার করেছেন। উপনিষদ, কোরান এবং বাইবেলের মূলকথাটি এক। এক ইচ্ছা করলেন বহু হতে। প্রকাশিত হ'তে। তাই বিশ্বজগত। দিনরাত্রি। জন্ম-মৃত্যু। যদিও হিন্দু সমাজে বহু দেবদেবী, শাক্ত-বৈষ্ণব, দুর্গোৎসব, রথ, দোল, রাসের অভ্যর্থনাই ছিল সমাজপ্রাণী। রামমোহন কলকাতায় আসেন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর ইংরাজী জ্ঞান তেমন ছিল না। কিন্তু স্বচেষ্টায় অর্জন করেন ইংরাজী। তিনি অধ্যয়ন করেন বেন্থাম, হিউম, রিকার্ডো মিল। বেন্থাম-মিলের বহুজনহিতায় আদর্শবাদ রামমোহনকে আগ্রহী করে তোলে। রামমোহনকে বাঙলার রেফর্মেশনের প্রধান

পুরোধারূপে জানি। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে "আত্মীয়সভা" স্থাপন করেন, যেখানে সন্ধ্যায় বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হ'ত। ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বিলাত যাত্রা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে। ধর্ম ও দর্শনক্ষেত্রে রামমোহনের ত্রয়ী সম্মেলন ঘটেছিল—উপনিষদীয় একেশ্বরবাদ, কোরানের একেশ্বরবাদ এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আঠারো শতকীয় যুক্তিবাদ। আমরা সকলেই তাঁকে 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন এবং সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকারী বলেই জানি। অনেকেই হয়তো জানি না—রামমোহন নারীর সম্পত্তির অধিকার অর্জনের জন্যও সংগ্রাম করেন ; যদিও বিফল হন। রামমোহনের বিশিষ্ট একটি মূল্যবান অর্জন—দেশজ থেকেও বিশ্ববীক্ষা। Universal Religion (তাঁর নামকরণ) যেমন স্বীকার করেন ইউনিভার্সাল মননকেও। যার উত্তরাধিকার নেন রবীন্দ্রনাথ। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্স (ফরাসী বিপ্লব হয়েছে) দেখবার আগ্রহ ছিল তাঁর। ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে ছাড়পত্রের আবেদনও করেন। ছাড়পত্র প্রথা অবাঞ্ছিত এবং একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের কথাও বলেন। বিশ্ব-মৈত্রীর ভাবনা যে কত বড় ছিল, তাঁর সেই চিঠিতেই জানা যায় : —"Hence enlightened men in all countries feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

ইউরোপের রেনেসাঁস তরঙ্গের পরে আরো দুটি ঢেউ উঠল। একটি অন্যদেশ আমেরিকায়, অন্যটি ফ্রান্সে। আমেরিকার ইংরাজ উপনিবেশিকরা ইংল্যাণ্ডের শাসকদ্বারা শাসিত হবার বিরুদ্ধে দীর্ঘ তেরো বছর আন্দোলনের পর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তেরোটি স্টেটকে এক ফেডারেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লব। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। রুশোর বাক্য :—মানুষ জন্মেছে মুক্তির মধ্যে, তবু সব জায়গাতেই বাঁধা শৃঙ্খলে। এই শৃঙ্খলে অনেকদিন ধরেই ঝন্‌ঝন্ ঝঙ্কার তুলছিলেন ফরাসী সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতিকরা। এই সময় দেখা দেন কোয়েকার দার্শনিক-লেখক টমাস পেইন। আমেরিকার স্বাধীনতার স্বপক্ষে যিনি ফরাসী বিপ্লবকে স্বাগত জানান। তাঁর লেখা দু-খানি-খ্যাত বই :—Rights of Man ও The Age of Reason। Rights of Man বইটির অপরিসীম প্রভাব পড়েছিল আমেরিকায়, এই বই লেখার অপরাধে তাঁকে স্বদেশেই মামলায় অভিযুক্ত হতে হয়। তাঁর শেষ জীবন কাটে আমেরিকাতেই,

সেখানেই মৃত্যু। The Age of Reason বইটি এমনি প্রতীকত্ব অর্জন করে, এই সেদিনেও Will Durant তাঁর বৃহদাকার বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের এক খণ্ডের নাম দিয়েছেন The Age of Reason। বইটি নব্য-বাঙলার যে তরুণ-সমাজের ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলে, তাদের নাম—ইয়ং বেঙ্গল। হিন্দু কলেজের এই ছাত্ররা, যাঁরা বেকন, লক, হিউম পড়ছেন, "they began to reason, to question, to doubt." তাঁদের আগ্রহ অধীর হল বইটি পড়বার জন্য। 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যে' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন :— "কেবলমাত্র একটা জাহাজেই এক হাজার সংখ্যক 'এজ অব রিজন' বই এসে পৌঁছল কলকাতায়।"

বিতর্কিত বাঙলা রেনেসাঁসের দ্বিতীয় নায়ক ইয়ং বেঙ্গলেরও অধিনায়ক। তাঁর নাম হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো। জন্ম ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, বর্তমান এণ্টালী পদ্মপুকুর সন্নিহিত মৌলালীতে। পোর্তুগীজবংশোদ্ভব এ্যাংলোইণ্ডিয়ান হয়েও তিনি এই দেশকেই আপন আত্মার আত্মীয় স্বদেশ রূপেই অনুভব করেন। অস্বীকার করব না, ডিরোজিয়োর রাগী ছাত্ররা একটু অধিক চপলতা প্রকাশ করেছেন ; মার্জনীয় এই কারণে যে এমন হয়েই থাকে। সমাজে যখন অন্যায় ও ইতরামির নোংরা স্রোত বহে যায়, রাগী যুবকদের উদ্ভব হয় সব দেশে, সব কালেই। মাত্র এই অপরাধে ডিরোজিয়োর গুরুত্ব খারিজ করা বা অকালপক্কতার অভিযোগ অযৌক্তিক। তাঁর ছাত্রদের মুক্ত-মনস্কতা, মননশীলতা, সত্য কথন ও বাগ্মীতাও কম ছিল না। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র সতেরো বছর বয়সে হিন্দু কলেজের সহকারী শিক্ষক হয়ে আসেন। অচিরেই তিনি "Master of English Literature and History" পদে উন্নীত হন। দর্শনেও অধ্যাপনা করতেন। কাণ্টের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা সেদিনের বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি কেড়েছিল। জাত-শিক্ষক ডিরোজিয়ো সম্বন্ধে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, ডিরেজিয়োর শিষ্যরা তেমনি আকর্ষিত হত। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিটি ছিল অভিনব। প্রায় গ্রীসিয়। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বলেছেন—

"...it was...more like the Academus of Plato, or the Lyceum of Aristotle." কথিত আছে সোক্রাতিসের পদ্ধতি ছিল তর্ক-বিতর্কের। ডিরোজিয়ো থাকতেন একপক্ষে, বিপক্ষে রাখতেন ছাত্রদের। বাগ্মীতার উদ্‌ভাবনা, আলোচনা ক্লাসে হতে পারে না তাই বাড়ির বৈঠক হল সভা। নাম এ্যাকাডেমিক

অ্যাসোসিয়েশন। ডিরোজিয়ো সহজাত ভালোবাসায় ছাত্রদের প্রতি কবিদৃষ্টিপাত রেখেছিলেন উন্মুক্ত। কবির মতোই দেখেছেন :

Expanding like the Petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers.

সে সময়ে বহুজন ডিরোজিয়োর বিরুদ্ধতা করেন। ফলে তাঁর হিন্দু কলেজের চাকরিতে নিজেই ইস্তফা দেন। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তার আগেও *Parthenon* নামে একটি পত্রিকা বার করেছিলেন। সংবাদ-পত্রের জগতেও যে মানুষটি স্মরণীয় কাজ করতে পারতেন, পারলেন না। মাত্র কয়েক মাস বাদেই ডিরোজিয়ো প্রয়াত হলেন। ইতিহাসের যে অংশে বাঙলা রেনেসাঁসের আবেদন, সেই অংশের প্রাপ্য সম্মানটুকু তাঁকে দিতে যেন কৃপণতা না করি। এই দেশই ছিল তাঁর স্বদেশ, তাঁর আত্মার আত্মীয়।

এই স্বদেশ-অনুভবের সঙ্গেই আমরা যেন মিলিয়ে নিতে পারি ডিরোজিয়োর শিক্ষকতা, তর্কসভা, সাহিত্যরস ও জার্নালিজমকে।

সেদিনের হুগলী, আজকের মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম থেকে যে বালকটি পদব্রজে পিতার সঙ্গে এসেছিলেন কলকাতায়, যানবাহন পাথেয় জোটেনি, দরিদ্রতম বালকটিই বাঙলা রেনেসাঁস-জগতের প্রধান ত্রয়ীর শেষতম। রামমোহন বা ডিরো-জিয়োর মতো সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সন্তান নন। ডেসিডিইরাস ইরাসমাসের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বৃদ্ধি পাননি। সবল দুই পায়ে, শক্ত হাতে, চওড়া কপালে, হৃদয়মধ্যে বিপুল তরঙ্গ, উঁচু মাথা, কঠিন ঘাড় তুলে সোজা দাঁড়িয়েছিলেন একাকী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়ন করেছেন—তাঁর দোসর ছিল না কেউ। প্রতিস্বিকতায় উজ্জ্বল মানুষগুলির দোসর থাকে না। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না। তাঁরা বহুজন মাধ্যমের সঙ্ঘেই একটি দোসরসমকে গড়তে থাকেন আজীবন। কখনো সেই সৃজিত স্রোতস্বিনীর জলধারা বর্ষার পদ্মার মতোই অকূল থইথই, কখনো ক্ষীণ-বৈশাখের বালুভরা তিরতিরে শান্তিনিকেতনের কোপাই। ত্রয়ীর শেষতম মানুষটি রাজা রামমোহনের প্রায় পরবর্তী প্রজন্ম। আর ডিরোজিয়োর অনুজ, এগারো বছরের ছোট। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জন্ম। তিনি দুই পূর্বজের অভিজ্ঞতাই আত্মস্থ করেন। ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের এলিটত্ব দেশের সব মানুষের মধ্যে প্লাবন বহাতে পারেনি, তা ছিল রেনেসাঁসের মতই for the few, for the intellectuals, যদিও বুদ্ধি-

যুক্তির কাজ ছিল গভীর নিয়োজন—বহুজনহিতায় হয়ে উঠল না—হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান নির্বিশেষে না হয়ে, মাত্র স্বল্পে আবদ্ধ হল। ডিরোজিয়ো শিষ্যদের চাপল্যও দেশে বহু শত্রু-সৃষ্টি সহায়ক হয়েছিল। রেফর্মেশনের যে অংশে ধর্ম—ঈশ্বরচন্দ্র সে অংশে নীরব। যে অংশে সমাজ-সংস্কার—সেই অংশেই সোচ্চার। মানুষটিকে আপন চরিত্র গড়ে তোলার কাজেই কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। দৃষ্টিকে এলায়িত করে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার ইচ্ছা তাই হয়নি। মুক্তবুদ্ধিকে কেন্দ্রে রেখে যে বৃত্তটি অঙ্কিত করেন, তাতে রেখেছিলেন শিক্ষা, নারীশিক্ষা বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। সমাজ কল্যাণকারী ইনষ্টিটিউশান্। সমাজের বহিরঙ্গ সংস্কারে শক্তি ক্ষয় করেননি। গিয়েছিলেন সমাজ-গভীরে। যা রামমোহনেরও অভীপ্সা। রামমোহনের মতোই ধন অর্জন করেন। অর্থ যে অনেকসময়ই সৎকর্মের অংশী—সেকথা বুঝেছিলেন। সংস্কৃত-প্রেস-ডিপোজিটরী, পুস্তক-মুদ্রণ, পুস্তক-বিক্রয় আয়োজন, আমাদের এই কথাই বোঝায় তিনি মধ্যযুগের পণ্ডিত ছিলেন না। বহিরঙ্গে ঐতিহ্য, অন্তঃচরিত্রে আধুনিকতম। জগৎকে তিনি বলেননি মিথ্যা, বলেননি মায়া, জাগতিক এবং যথার্থ মানবিক (humanist) অর্থে বিদ্যাসাগর আশ্চর্য ঋজু।

রামমোহনের গদ্য রচনা যতখানি মুক্তবুদ্ধির সহায়ক, ততখানি সাহিত্য রসসিক্ত নয়। ডিরোজিয়োর সাহিত্যরস ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত। বিদ্যাসাগর যথার্থ সাহিত্য-শিল্পী। আমাদের মধ্যে যাঁরা কিছুদিনের পুরানো মানুষ তাঁদের কানে এখনো ধ্বনিত বাল্যকালের পঠিত পাঠ্যাংশটি, নিবিড়-গম্ভীর, গভীর-মধুর রসসিক্ত মেঘমন্দ্র সজল জলদের মতোই :

"লক্ষ্মণ বলিলেন,—আর্য্যা, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় সমাচ্ছন্ন।"

যুগান্তকারী মানুষ তিনটি কিন্তু অজাতশত্রু ছিলেন না। থাকেনও না। কাল-প্রবাহ স্রোতে গা না ভাসিয়ে যাঁরা নতুন কিছু করতে চান, প্রাচীন সমাজের বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয়। সোক্রাতিসকে বিষপাত্র মুখে তুলে ধরতে হয়েছিল। আধুনিক যুগেও সেই বিষপাত্র এসে পৌঁছয় বিদ্বৎজনের মুখে প্রতীকী অর্থে। ঐতিহাসিক টয়েনবির বিবেচনায়—"an intelligentsia is born to be unhappy." যদিও ম্যানহাইম যে অর্থে বলেছেন—This unanchored relatively classless stratum, বিদ্যাসাগরকে সেই অভিধায় অভিহিত করা যায় না। নোঙরহীন তরণী তিনি ছিলেন না। তবু শেষজীবনে তাঁর স্রোতস্বিনীটি

হিমগিরিহীন নদীর মতই বালুতে ভরে উঠছিল। শেষজীবনে বিদগ্ধ সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চলে যান কারমাটারে। অরণ্য-আচ্ছন্ন আদিবাসীদের মধ্যে। একেবারে থেমে যাননি। তাদের আধি-ব্যাধিতে সাহায্য করেছেন। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় নিযুক্ত হন। তাজুল ইসলাম হাশমী যে উক্তি করেছেন : —"তিনি গণশিক্ষার বিরোধী ছিলেন।" আমার মতে তা একেবারেই সত্য নয়। বাঙলা বর্ণমালা বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা, এদেশ ওদেশ দুই দেশের বাঙালিরাই আজও অস্বীকার করতে পারেনি। সাঁওতালী বর্ণলিপি নিয়ে কিছু কাজ করেছিলেন কিনা, আমার জানা নেই। তবু মনে রাখা ভালো, তখন তিনি বার্ধক্য-পীড়িত, অশক্ত এবং অসুখী মানুষ। সর্বোপরি মানুষ। অতিমানব নন। তাঁকে অবতার করে তোলা যায় না। চারপাশে মিরাকল্‌স্ সাজে না ; তা মানায়ও না বিদ্যাসাগরকে। আর ইউরোপেও রেনেসাঁস কোনো তৃণমূল পর্যায়ের জাগরণ নয়। তা অল্পসংখ্যকের জন্য মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের জন্য, শিক্ষিত বিদ্বৎ-সমাজের জন্য।

বাঙলা রেনেসাঁস বিতর্কিতই। ইতালীর রেনেসাঁসে ভরা জোয়ারে বাণ ডেকেছিল। গ্রীসের মনন তাকে মুক্ত-মনস্কতা দিয়েছিল, পর-অধীনতার (ফাঁস) পরায়নি। রেনেসাঁসের বাঙলা ভারতসহ হয়ে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণ-খনি উপনিবেশ। কাঁচামাল লুঠে নিয়ে পাকা মাল ফিরে পাঠাবার মুনাফা-তৈরীর নিশ্চিন্ত-নিরাপদ এক অধীন দেশ। তবু জোয়ারে বাণ ডেকেছিল। ইংরেজী শিক্ষা, মুদ্রণ-যন্ত্র, সংবাদ পত্রের আবির্ভাব স্বচ্ছ মনের ভাব প্রকাশের জন্য গদ্য রচনা। বর্ণপ্রথা, কুলপ্রথার গণ্ডী পার হয়ে ব্যক্তিমানুষের উদ্ভব, এণ্টারপ্রাইজিং মানুষের ; অব্রাহ্মণ ও নারীসমাজ, স্বীকৃতির বাণ ডেকেছিল বৈ-কি !

এই বিতর্কিত রেনেসাঁসের গভীর মর্মভেদী বেদনা বিভাজন। বিনয় ঘোষ, কাজী আবদুল ওদুদ, তাজুল হাশমীও বড় ফোভেই এই ট্র্যাজিডির কথা বলেছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলিত ঐক্যে এই রেনেসাঁস ঘটেনি। প্রথমদিকে মুসলমানরা রাজশক্তির অহংকার ও অভিমানেই দূরে ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতাও করেছেন। হিন্দুরাই এগিয়ে এলেন বিদ্যা-বিত্ত অর্জনে। তাঁরাই হলেন কলিকাতা নগরীর উচ্চবিত্ত ও বিদ্বৎ-সমাজ। মুসলমান সমাজ উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী থেকে নেমে ধীরে ধীরে হয়ে গেলেন নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সমাজ। তাঁরা যখন সচেতন হলেন, ইংরেজ শাসকও তখন অত্যন্ত সচেতন। ইতিমধ্যে হিন্দু বিদ্বৎ ও শিক্ষিত সমাজে পরাধীনতার গ্লানিতে জন্ম নিয়েছে জাতীয়তাবোধ। যে বিভাজনটি পূর্বেই ছিল তাতে উৎসাহে শাণ লাগালেন শাসক-সমাজ। ব্যবসায়ী

হিন্দু-সমাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঢালাও আরামে জমিদারী কিনে বিলাসে মত্ত হলেন—বণিকতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে অগ্রসর হলেন না—আর দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান চাষীগুলি তাদের জমি হারিয়ে (যেহেতু পূর্বের উৎপন্ন চাষের আনুপাতিক কর আর থাকল না) দরিদ্রতর হয়ে যেতে লাগলেন। সামন্ততন্ত্রের যেটুকু সুফল তা গেল। ধনতন্ত্রের যেটুকু পাওনা, তার প্রাপ্তি হল না। ভাঁটার টানে বাঙলার মাটি বেরিয়ে হয়ে গেল আটফাটা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেও তাদের কর জোগাতে হয়েছে রাজার এবং জমিদারের। যা মুসলমান যুগেও মকুব হয়ে যেত দেশ শস্যহীন হলে ! ফলে বাঙলা হারাল অজস্র হিন্দু-মুসলমান সন্তান। যাঁরা বেঁচে থাকল তারাও সেই রক্তকরবীর "রাজার এঁটো"।

চিত্রীর চিত্রকে ধরে রাখার সহায়ক ইজেল। অবশ্য চিত্রী যখন আঁকেন। উপরিউক্ত রচনাটুকু বিতর্কিত বাঙলা রেনেসাঁস সেই ইজেল। সামাজিক ও বৌদ্ধিক পরিবেশ (দ্য সোস্যাল এণ্ড ইন্‌টেলেকটুয়াল ব্যাক্ গ্রাউণ্ড)। এর ওপরই শিল্পী সাহিত্যিক তাঁর রচনাকে সাজান। শক্তিমানের শক্তি অনুযায়ীই চিত্র রূপ নেয়। কোনো কোনো লেখক জাতির প্রশ্নময় মুহূর্তগুলিকে দর্পণায়িত করেন। প্রতিভাধর কোনো প্রাতিস্বিক এই প্রশ্ন থেকে নতুন প্রশ্নের জিজ্ঞাসা আনেন ভবিষ্যতের ইংগিতবহ। তখন ছবি আর ইজেলে আবদ্ধ নয়। সমস্ত সিদ্ধকাম রচনাই যূথ এবং ব্যক্তির গভীর সম্পর্ক সঞ্জাত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির স্ফুরণে আগুন জলে না। প্রচারসর্বস্ব বা উচ্চচূড়বাদী হয়ে যায়। প্রতিভাধর লেখক দেশকাল স্বীকার করেও কালোত্তীর্ণ এবং বিশ্বস্বীকৃতি যেতে চান। না হলে অন্যকালের এবং অন্য দেশের সিদ্ধি শ্রেষ্ঠ (মাষ্টারপীস) রচনাগুলিকে আমরা অস্বীকার করতাম। একথাও সত্য, অনেক প্রতিভাধরের মহৎ অনুভবের পাশেই মিশ্রিত থাকে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি। হয়তো দেশকাল বা কোনো বিশিষ্ট সমাজের ক্ষুদ্রগণ্ডীতে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ হয়ে গিয়ে এমন ভ্রান্তি এসে যায় !

বহু সময়েই সাহিত্যে এমনও দেখা যায় খণ্ডতার প্রভাব। ফ্রয়েডবাদীরা বায়োলজিকাল ফেনোমেননকেই বিশেষ জায়গা দিয়েছেন। মানুষ বাসনার (ডিজায়ার) শিকার, ডারউইন তত্ত্ব অনুযায়ী simply a part of nature ; মার্ক্সবাদ অনুযায়ী মানুষের ধ্যানধারণা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত ; বার্টণ্ড রাসেল একদা বলেছেন : মানুষের উচ্চাশা, আশা "but the outcome of chance collocations of atoms," H. A. Overstreet বললেন, একমাত্র মানুষই তার নিজের সীমা পার হয়ে যেতে পারে, খৃষ্ট ধর্মে মানুষ পাপোদ্ভব, তার

শুভ প্রসারিত একমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভে ; হিন্দু দর্শনে মানুষ আনন্দজাত। যে লেখক মানুষের সব খণ্ডগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হার্মনিতে সাজিয়ে উঁচু, নিচু, গভীর, তীব্র, গগণভেদী দূর সুদূরে মিলিয়ে যেতে থাকা সুরেলা আবেশে মানুষের জীবন সংগীতকে বাজিয়ে তুলতে পারেন, সেই গুণী লেখকই খণ্ডমানুষ না রচনা করে করেন অখণ্ড সম্পূর্ণ মানুষ। এই দিক থেকে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য কালগত এবং ভাবগতভাবে কতখানি সার্থক তা বিবেচ্য। বিতর্কিত রেনেসাঁসের পর মধুসূদন, যিনি শেকস্‌পীয়র-শিষ্য, বায়রনে মুগ্ধ, এবং বাল্মীকিতে অশেষ শ্রদ্ধা, লিখলেন মিলটন অঙ্গিকে মেঘনাদ বধ কাব্য। পেত্রার্কীয় সনেট যা শেক্‌স্‌পীয়রকেও অনুপ্রাণিত করেছিল, মধুসূদনকে প্রবৃত্ত করায় চতুর্দশপদী সনেট রচনায়। তাঁর নারীচরিত্রগুলিও শেক্‌স্‌পীয়র-অনুরূপ ; পুরুষচরিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বল।

হিন্দু-ঐতিহ্যবাহী প্রতিভাধর বঙ্কিমের মহৎ গুণাবলীর পাশেই থাকা এক ভ্রান্তি মুসলমান সমাজকে ক্ষুব্ধ করেছে, বেদনা দিয়েছে। তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধাবলী, বঙ্গ-দর্শন সম্পাদনার অসাধারণ উজ্জ্বল আলোকপাতের পাশেই লেগে থাকা একটুখানি ছায়া সেদিনের বাঙলার অর্ধ সমাজ বড়ো দীর্ঘশ্বাসেই গ্রহণ করেছে। আনন্দমঠ পাঠের পর আমাদের ধারণা হতেই পারে সেখানে সন্ন্যাস-বিদ্রোহ ব্যাপক জায়গা নিয়েছে! আর সেই চিত্রপটে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল রঙে হিন্দু-ঐতিহ্যবাহী ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুরাণী। যদিও যদুনাথ সরকারের মতে, সন্ন্যাস বিদ্রোহের মানুষগুলি বিদ্রোহী নন, বাঙালিও নন, ভগবদ্‌গীতা ইত্যাদির নামও অজানা। নিরক্ষর বহিরাগত দস্যুমাত্র। পরবর্তীকালে প্রমাণিত যে সন্ন্যাসবিদ্রোহ উত্তরবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান মিলিত বিদ্রোহ, তাতে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান ফকিরও কম ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান সমাজ আশা করতে পারেন ; এমন প্রতিভাধর লেখক, যাঁর কলমে এত জোর—বীর চরিত্র, মহৎ চরিত্র, রূপায়ণে কেন আকবর বা শের শা'র মতো কাউকে বেছে নিলেন না ?

রবীন্দ্রনাথ, আমার মতে যিনি সবচেয়ে বেশি ঐকতান তুলতে পেরেছেন, আজীবনব্যাপী নিরলস শিল্প-সাধনায় যিনি শেষজীবনে ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে আধুনিক বিশ্বদীক্ষায় বেরিয়ে এসেছিলেন অসাধারণ চিত্রীরূপে, তিনিও কেন জানিনা একটি শিল্পদিককে প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন অল্প স্পর্শ করেই। সামান্য স্পর্শসুরের মতো লাগিয়েছেন তাঁর রাগিণীতে। গল্পগুচ্ছের "দুরাশা" গল্পের নায়িকা সেই স্পর্শসুর। আমার মনে ক্ষোভ জাগে, যিনি জগমোহনের মতো মহৎ নাস্তিক, শচীশের মতো গভীর অস্তিত্ববাদী (existentialist) আস্তিক, পরেশবাবুর মতো সৌম্য-অবিচল

ব্রাহ্ম, আনন্দময়ীর মতো স্নিগ্ধ, সংস্কারহীন হিন্দু সৃজন করলেন, কেন কোনো মহৎ মুসলমান চরিত্র ফুটে উঠল না তাঁর কলমে! মাত্র এই একটি জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ বিতর্কিত ও বিভাজিত ইতিহাসের ইজেল ছেড়ে বার হয়ে আসেননি।

আমাকে এইখানেই থামতে হবে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ত্রয়ীর মূল্যায়ন, ব্যাপক অধ্যয়ন, সমালোচন-শক্তি, সৃজন-ক্ষমতার বিশেষ অধিকার অর্জন দরকার করে। মাত্র একটি প্রবন্ধে তা হবার নয়। বহু প্রবন্ধ এবং অন্য গ্রন্থের দাবী রাখে।

যে বইগুলির সাহায্য নিয়েছি :—

১. The Story of Civilization : Part V. Will Durant (The Renaissance.)
২. A History of Western Literature—J. M. Cohen.
৩. Literary Criticism (A Short History)—William K. Wimsatt & Cleanth Brooks.
৪. A History of French Literature—L. Cazamian.
৫. A History of English Literature—Emile Legouis & L. Cazamian.
৬. The Modern Age—Volume 7, Edited by Boris Ford.
৭. A History of Economic thought—Eric Roll.
৮. Science and the Modern World—Alfred North Whitehead.
৯. Literature of Bengal—R. C. Dutta.
১০. The Mature Mind—H. A. Overstreet.
১১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
১২. রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩. বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়)—ভূদেব চৌধুরী
১৪. বাংলার বিদ্বৎ সমাজ—বিনয় ঘোষ
১৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ
১৬. বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার
১৭. Vidyasagar (the traditional moderniser)—Amalesh Tripathi.

১৮. বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ
১৯. রেনেসাঁস ও সমাজ-মানস—অরবিন্দ পোদ্দার
২০. ঔপনিবেশিক বাঙলা—তাজুল ইসলাম হাশমী
২১. প্রসঙ্গ : ইতিহাস—সুশোভন সরকার
২২. The Cultural Heritage of India, Vol. IV, Editor Haridas Bhattacharya.

উত্থিত বিষাদ : হে সারথি রথ প্রস্তুত করো

পথিক বসু

১

"যদি এই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয়, আকাশ রঙিন—"

কবি অজিত দত্ত প্রশ্ন করে ফেলেন :

"তবে কি এ পৃথিবীর ছদ্ম নটীবাস
শাস্ত্র শস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মুহূর্তের অভিসারে
প্রাণের নিভৃতে এসে খসে' পড়ে' যাবে একেবারে ?"

যাবে কি ?

যায় না। হৃদয়ের রঙ দিয়েই এ শাস্ত্রশস্ত্র রাজনীতি গড়া, এ রঙ আকাশে উড়বে, রোদে ভাসবে—এ রঙই আবার বণিক-বিনাশ-বিধ্বংস হয়ে থাকবে। যাবে না।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ মোহভঙ্গের যুগ। পশ্চিম ইউরোপে ভেঙে পড়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন, জার্মানে বামমার্গী শ্রমিক শ্রেণী হয় সংশোধন-বাদের কবলে অথবা মস্কোপন্থার গোঁড়ামিবাদে নিমজ্জিত, রুশ ইতিহাসে স্টালিন-বাদের নামে এক অবিপ্লবী ভয়াল নায়কতন্ত্রের জন্ম এবং জার্মান ইতালীর আনাচে-কানাচে ফ্যাসীবাদ-নাজীবাদের অভ্যুদয়। মোহভঙ্গের যুগ সে সময়কার ইউরোপে।

হাতগোনা কয়েকজন তাত্ত্বিক দুখানা মারাত্মক সিদ্ধান্ত মানলেন। এক, রুশ সমাজতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র আর নেই, অতএব বিপ্লবের সম্প্রসারণ ঘটাতে নিশ্চেষ্ট থাকবে রুশী মার্কসবাদীরা। দুই, সার্বিক গণজাগরণ যেভাবে বিস্রস্ত ও বিভ্রান্ত তাতে মার্কসতত্ত্বের নতুনত্ব আবশ্যক অথবা মার্কসতত্ত্বের বিপজ্জনক সম্বন্ধে বুর্জোয়াবাদীরা সচেতন ও সুরক্ষিত। সিদ্ধান্তকাররা একত্রিত হলেন, উনিশশো তেইশে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে স্থাপন করলেন মার্কস শিক্ষাশিক্ষণের ক্রিটিক্যাল স্কুল, পরবর্তী পর্যায়ে সেটি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নামে প্রসিদ্ধ—তাত্ত্বিকেরা যেমন ম্যাক্স হোর্খেইমার

(দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক), ফ্রিডরিখ পোলোক (অর্থনীতিবিদ), হার্বার্ট মার্কুস (দার্শনিক, মনোদার্শনিক), এরিখ ফ্রম (ফ্রয়েড-বিশেষজ্ঞ, সমাজ-তাত্ত্বিক, সংগীতবিদ্) ইত্যাদি।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল মার্কসতত্ত্বের অসঙ্গতি এবং পুঁজিবাদের বিস্তার সম্বন্ধে যৌথ গবেষণা করেছিল—মার্কসতত্ত্ব কোথায় থেমে আছে সেটা যেমন তারা দেখাতে সক্ষম হয়েছিল, ঠিক তেমনি পুঁজিবাদ কতদূর এগিয়ে আছে সেটাও তারা চিহ্নিত করতে পেরেছিল, যেসব কারণে ষাট সত্তর দশকের নিউ-লেফ্‌ট সমর্থকেরা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষণাকে মার্কসোত্তর উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ বলে মেনে নিয়েছেন।

সেই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এখনকার আলোচনায় এসে পড়ছে, আসছে বিশেষ একটি অধ্যায়কে ব্যাখ্যা করতে, অধ্যায়টি হল বিচ্ছিন্নতা—বাস্তব সমাজ আজকের পুঁজি-বাদী সমাজের কারিগরী ব্যবস্থা কিভাবে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তুলছে তার ছবি বুঝতে আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষণাকে এইবার একেকটি পর্যায়ে সাজিয়ে ধরছি।

২

প্রথমে প্যারামিটার দুটো পরিস্কার করে নিই। বিচ্ছিন্নতা এবং টেকনোলজি। বিচ্ছিন্নতা হল আত্মসংযোগ বিনাশ। নিজের কাজের প্রতি নিজের অজ্ঞানতা অথবা অনাস্থা। এই বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে মানুষ, ভুগতে ভুগতেই মানুষ উৎপাদন যজ্ঞে মেতে উঠছে; সে স্রষ্টা কারিগর বিজ্ঞানী সে কর্মী করণিক শ্রমিক এবং বিচ্ছিন্নতা জরে আক্রান্ত। অন্যদিকে কতিপয় মানুষ, অসাধারণ পরিকল্পনাবিজ্ঞ মানুষ অসংখ্য বিচ্ছিন্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে বিচ্ছিন্ন করেই, সময়মতো দানাপানি দিচ্ছে টিভি পপ জ্যাজে ভাসিয়ে দিচ্ছে—কোনো ব্রজদা আক্ষেপ করছে না: একে কি আর বাঁচা বলে!

কিভাবে ঘটেছে? একটা প্রক্রিয়ার নাম টেকনোলজি, টেকনোলজি আজ আর নিছক প্লান প্রোগ্রাম ডায়াগ্রামের পলি-প্যাকে আঠাশ টাকার গলানো সোনা নয়, হত্যা হন্তা ত্রাসের বর্ষুক আজকের টেকনোলজি, যার মুখ্য অবদান মানুষকে মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দৈহিকভাবে তাদের একটা উৎপাদন চক্রে নিংড়ে নেয়া।

৩

শুরু করি টেকনোলজি-সংলাপ-বিচ্ছিন্নতা থেকে, অথবা আরো গভীরে, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের মার্কস-মূল্যায়ন থেকে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল প্রশ্ন করেছিল মানুষের মুক্তি কিভাবে সম্ভব। চোখের সামনে তখন সদ্য ঘটে যাওয়া আঠারোর রুশ বিপ্লব, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা-সত্যতার শিরোনামে কার্ল মার্কস, তাই উত্তরটা পাবার জন্য স্কুলকে মার্কসের দিকেই আনত হতে হল।

মার্কস এমন একটা মানবমুক্তির কথা আজীবন ভেবেছেন; ভেবেছেন, দেখেছেন সমাজ এমন একটা বাতাবরণে সবাইকে ঠেসে ধরেছে যাতে একমাত্র নিরবিচ্ছিন্ন বিপ্লব মারফৎ মুক্তি সম্ভব। সেই বিপ্লবের ছক অথবা কার্যকারণ ততোটা বিশ্লেষণ না করলেও মার্কস সমাজের আগ্রাসী প্রতিবৈপ্লবিক প্রবণতা ব্যাখ্যা করেছিলেন—এই শোষণ-সর্বস্ব পুঁজিবাদ কিভাবে শ্রমিককে নিংড়ে নিয়ে জ্যান্ত, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিবরণ ঘটেছিল তাঁর গবেষণায় এবং মানবমুক্তির অন্তরায় যে সমাজব্যবস্থা সেটার দিকে তিনি জোর দিলেন বেশী অর্থাৎ অর্থনীতিতে চলে গেলেন; ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব যদিও মানবমুক্তির বড়ো উপাদান—তাকে বিবেচনায় আনার সময় পেলেন না মার্কস। আর সেটাই আপত্তির হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কাছে।

স্কুল দেখেছিল ব্যক্তি মানসিকতা আর গণ মানসিকতায় একটা গুণগত ফারাক রয়েছে, যে ফারাকের ফলে ব্যক্তির মুক্তি গণমানসিকতার সাথে সমীকরণভুক্ত করা যাচ্ছে না, অর্থাৎ একটা সমাজবিপ্লব কি প্রকৃতিবিপ্লবে গণমানসিকতা কিঞ্চিৎ রিলিফ পেতে পারে বটে কিন্তু মানবমুক্তি সম্ভব নয়, যেহেতু দুই মানসিকতায় গুণ-গত ফারাক বিদ্যমান, অতএব মানসিক গুণকে বিবেচনায় আনতে চাইল স্কুল।

সব মিলিয়ে তাহলে মার্কসের সীমাবদ্ধতা এমন কি হয় না যে মানুষের non pathological psyche-কে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিয়েছিলেন মার্কস? ঘটনাটা তাই। মার্কস মানবমন নিয়ে দু'রকম কাজ করেছেন। প্রথমটায় তিনি অর্থনীতি-রাজনীতির সমস্যাকে মূলে ধরে মানবমনস্তত্ত্বকে বিচার করতে চেয়েছেন, যেমন fetishism of commodities—এখানে পণ্য প্রথম, সেখান থেকে শ্রমের বিচ্ছিন্ন ভূমিকা, সেখান থেকে পঙ্গু মানবমনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মার্কস। গবেষণার ধারা সঠিক (তাতে আপত্তি নেই), আপত্তি হল এই ধারা অনুসরণ করে মানবমন বোঝা যায় না—মনের একটা বিশেষ বিকৃতির অবস্থা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত মার্কস মানবমনের সাধারণী একটা ক্ষমতাকে রাজনীতি-অর্থনীতির নগ্নতা বোঝাতে তুলে ধরেছিলেন, সেটা সার্বিক তবে pathological-ই, নাম তার বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা মানুষের এক পরিস্থিতি, বিশেষ একটা পরিস্থিতি তবে সার্বিক কখনোই নয়, তাই যদি হত তাহলে যে মার্কসই অনুপস্থিত থাকতেন, বিপ্লববোধ বলে কিছু থাকত না। মানবমন নিয়ে গবেষণা করতে হলে এবং মার্কস প্রসঙ্গ এলে মার্কসের

এই দুটো খুঁতের কথা বলতেই হয়, কিন্তু এরা খোদ মার্কসীয় মতবাদের খুঁত নয়। মার্কসীয় মতবাদ শোষণকে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিল, সে কাজ করতে গিয়ে মার্কস মানুষের বিচ্ছিন্নতা কি পণ্যরতির কামনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন—এর মানে এই নয় যে পণ্যরতি কি বিচ্ছিন্নতা নেই, অথবা মার্কসের শোষণবিরোধী তত্ত্ব ভ্রান্ত, স্কুল কখনোই সে কথা বলছে না, স্কুল বলতে চাইছে মার্কসের এই গবেষণা থেকে মানবমনের সার্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়—ওটা মনের pathological দশা, nonpathological অবস্থা কিছু আছে যার পরিস্কার মূল্যায়নে সম্ভব মানবমন বোঝা।

আমরা একটা ছোট্ট মজায় পড়লাম। মার্কসতত্ত্ব অনুসারে বিচ্ছিন্নতাকে আমরা যথাসময়ে ব্যাখ্যা করব। মজা সেটিকে নিয়ে নয়, মজা স্কুলের সাথে আমাদের আচরণের। আমাদের আলোচনা বিচ্ছিন্নতা নিয়ে, যে বিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত মার্কসীয় জ্ঞানকে অস্বীকার করেনি স্কুল, তাহলে স্কুলের জন্য আলাদা করে অধ্যায় টানার প্রয়োজন কোথায়? মার্কসতত্ত্ব আলোচনা করলেই তো শেষ হয়ে যেতে পারত।

না, তা নয় শেষ হত না। স্কুল মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতার চেয়ে আরো অনেক পা এগিয়েছে। স্কুল মার্কসীয় খুঁত দুটো (যাদের কথা একটু আগে বলা হল) বার করে বিশুদ্ধ non-pathological মানবমনের অনুসন্ধান করতে চাইল ঠিকই, কিন্তু সে চাওয়া কিসের প্রয়োজনে? গোড়াতেই বলেছি: মানবমুক্তি সেই চাওয়া; তারা দেখেছিল মানবমুক্তি নিয়ে বলিষ্ঠ ভাবনাটা মার্কস ভাবলেও, একটা বিপ্লব ঘটে গেলেও মানবমুক্তি ব্যাপারটা দূরস্ত হয়ে গেছে—তার মানে মার্কস নিশ্চয়ই কোন কিছুকে গ্রহণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন—সেটা কি?

সেটার অনুসন্ধানে স্কুল বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্ব প্রথমে বুঝতে চাইল, তারপর সেখান থেকে অবিশুদ্ধ মন···দেখা যাবে এ অবিশুদ্ধ মন মার্কসীয় গননার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর ও বিকট। স্কুলের প্রয়োজন এই আর এতটা এসে স্কুলের প্রয়োজনে এলেন ফ্রয়েড, শ্রদ্ধেয় সিগমণ্ড ফ্রয়েড।

৪

সিগমণ্ড ফ্রয়েডের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন সম্ভবত তাঁর পেসিমিজম, পেসিমিজম ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কাছে গিয়ে পৌঁছল মানুষের ever flowing pathological syndrome-এ। স্কুল দেখল বিপ্লবের পরও স্টালিনবাদ জন্ম নেয় অথবা বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকলেও সেটা মরে যায়—কে করায়? অবশ্যই মানুষ, কিন্তু কোন

মানুষ? এ মানুষের কথা তো মার্কস ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, তিনি ভেবেছিলেন একটা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেলে যেমন অর্থ নৈতিক শোষণের অবসান হবে তেমনি মানবমনও সমুচ্চ হয়ে উঠবে—হল কই?

না হওয়া একদিকে, ফ্রয়েডীয় পেসিমিজম আরেকদিকে—দুটো মিলে গেল সহজে, তৈরী হল খড়কুটো, ভাসতে লাগল মহাসমুদ্রে: মার্কসতত্ত্বে। তাকে শক্তসামর্থ নৌযান বানাতে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ফ্রয়েডে গভীর প্রবেশ করল।

স্কুল ফ্রয়েডকে গ্রহণ করল একটা বিশ্বাসে এবং তিনটি যুক্তিতে। ফ্রয়েড গ্রাহ্য হলেন, সমালোচিত হলেন।

ফ্রয়েড সুখনীতির (pleasure principle) প্রবর্তন করেছিলেন। ফ্রয়েড বলেছিলেন মানুষ তার ইদ্‌বৃত্তিকে অচেতন অংশ থেকে উৎক্ষেপ করে, সমাজজীবনে সেই উৎক্ষেপন তথা ইচ্ছার সাফল্য সুখবোধ এনে দেয়। এবং এটার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সমাজসংসার মানবজীবন; বাস্তব সমাজ তার নিজস্ব নিক্তিতে বিবেচনা করে দেখবে সুখভোগকে মানা যায় কি যায় না—ফ্রয়েড এই ব্যবস্থার নাম দিলেন বাস্তব-নীতি (realist principle)। ব্যক্তির সুখ কাম সবসময়ই তো চরিতার্থ হয় না বরং যে মানুষ যত শোষিত যার ক্ষমতা যত কম তার অচরিতার্থতা তত বেশী। সবসময় একটা দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েন চলছে; অতএব আমার কাম্য কখনো মিটছে কখনো অবরুদ্ধ হচ্ছে। এই সংঘর্ষকালীন পরিবেশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল মেনে নিলেন, বিশ্বাস করলেন যে এটি সর্বতো সত্যি, লিখলেন মার্কুস তাঁর *Eros and Civilization* (প্রকাশক Allen Lane, The Penguin Press: 1970) বইতে: Men do not live their own lives but perform pre-established functions. While they work, they do not fulfil their own needs and faculties but work in alienation. Work has how become general, and so have the restrictions placed upon the libido: labor time, which is the largest part of the individual's life time is painful time, for alienated labor is absence of gratification, negation of pleasure principle. Libido is diverted for socially useful performances in which the individual works himself only in so far as he works for the apparatus, engaged in activities that mostly do not coincide with his own faculties and desires. স্কুলের মতে সুখনীতি আর বাস্তবনীতির দ্বন্দ্বই হচ্ছে মানুষের

প্রকৃত সত্তা (essence অর্থে), শুধু তাই নয়—সমাজ যে অসভ্যতা বাড়িয়ে তুলেছে (কথাটা সার্ত অন্য কোণে বিচার করেছিলেন) তার মূল কারণই হল এই দ্বন্দ্ব —এটা greatest traumatic event of human history।

বিশ্বাসের সাথে সাথে যুক্তির জন্মও ঘটল। কেন ফ্রয়েড গ্রহণ করব—এই প্রশ্নে স্কুল তিনটে যৌক্তিক উত্তর পেল।

ফ্রয়েডীয় মনোদর্শনের মধ্যে মানসিকতার কৃত্য কাঠামোটিকে (formal structure) খুঁজে পাওয়া যায়, যাকে সমালোচনা কিংবা প্রতি আলোচনা যেমন মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা তেমনি মানবচরিত্রের প্রকৃত বীক্ষণ সার্থক হবে বলে মনে করল স্কুল।

দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েডীয় মনোদর্শন অনুসরণ করে স্কুল মানুষ এবং সমাজের মনোবিকৃতির পর্ব-পরম্পরা খুঁজে পেল, যাদের mass society আর মানব চৈতন্যের দ্বান্দ্বিক বিকাশের যথার্থ ব্যাখ্যায় আনা যাবে বলে মনে করল স্কুল।

তৃতীয়ত, ফ্রয়েডবাদ ধরে মানসিক রাজ্যে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে মনে করল স্কুল। ফ্রয়েডবাদের অগাধ পেসিমিজম থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে মানুষের চৈতন্যগত রহস্য বোঝা সম্ভব ; যে রহস্য ভেদ করে পাওয়া যেতে পারে আশার পথ, মুক্তির পথ। কারণ ফ্রয়েডবাদের মানুষ মূলগতভাবে যে নিউরোটিক সেকথা ঠিক, আর সেই ঠিককে টানতে টানতে ফ্রয়েড মানুষের পঙ্গুতাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এলেন যা থেকে খুব সহজেই সুস্থ সবল মানুষকে কল্পনায় আনা যায়, যৌক্তিকভাবে আনা সম্ভব, সম্ভবত সে মানুষই শ্রেষ্ঠ, তার মানবধর্মে প্রাজ্ঞ। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সেকথা স্বীকার করল। এক অর্থে ফ্রয়েডের ওপরে যাবার চেষ্টাও শুরু করল।

৫

ফ্রয়েড গ্রহণের তিনখানা যুক্তি এবং গ্রাহ্য ফ্রয়েডে একটা নিদারুণ বিশ্বাস অতঃপর ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলকে ফ্রয়েডবাদ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক গবেষণায় প্রবৃত্ত করে। তাঁরা ফ্রয়েডীয় সুখনীতি বাস্তবনীতির দ্বান্দ্বিক মুহূর্ত এবার পারিপার্শ্বিকতা স্বীকার করে নিলেও ফ্রয়েডবাদের বেশ কয়েকটা অংশকে অস্বীকার করতে চাইলেন। যাদের একটি অংশ এখানে আলোচনা করা হবে, মনে রাখতে হবে আমাদের উত্থিত বিষাদ হল বিচ্ছিন্নতা।

আগেই বলা হয়েছে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের মূল লক্ষ্য ছিল মানবমুক্তি। খুব সহজ যুক্তি সাজাল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। স্কুল দেখছে মানবসভ্যতা বিপর্যয়ের মুখে থাকলেও মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকলেও মানুষ মুক্তি চাইছে, চাইবে ; যদি

তাই হয় তাহলে ফ্রয়েডীয় death wish অথবা thanatos কি আদিতে থাকতে পারে ? একটা প্রবৃত্তি হিসেবে থাকতে পারে ? মানুষের আদিতে যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে তাহলে মানুষ মুক্তি চায় কেন ? মানবমুক্তি ব্যাপারটা তো আর গোলগাল প্রলাপ নয়, বাস্তব সত্য ; সে যদি সত্যই তাহলে মানুষের আদিতে কখনোই thanatos থাকবে না। অন্যদিকে ফ্রয়েডও একটা যুগযন্ত্রণার সাক্ষী দ্রষ্টা, ইহুদী বলে তিনি কম নির্যাতন সহেন নি। তিনি দেখেছিলেন কখনো কতিপয় হাতগুণতি মানুষ শান্তি চাইলেও জনসাধারণ মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংসাকাঙ্ক্ষায় বর্বর ও নৃশংস এবং সভ্যতার অগ্রগতি মানেই হল নৃশংসতা—অতএব এই প্রবণতা তথা thanatos মানুষের নিশ্চয়ই আদিতে, আদি ইচ্ছা যা থেকে মানুষ মুক্ত হতে অক্ষম, কতিপয় পারে তার ঊর্ধ্বে যেতে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অপারগ ; অর্থাৎ মৃত্যু-ইচ্ছার আদিতে থাকা যৌক্তিক যেহেতু মানুষের ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা বাস্তব সত্য।

বোঝা যাচ্ছে ফ্রয়েড এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সম্পূর্ণ উল্টোমুখো পথে হাঁটতে চাইছেন, যার ছবি স্পষ্ট কিন্তু কোনটা সঠিক তা বিচার করা সম্ভব নয়, যেহেতু দুটোর চেহারা দু'রকম।

এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষণা তখনকার আলোচনা বলে স্কুলের মতামতকে অনুসরণ করতে হচ্ছে আমাদের। স্কুল বিরোধিতা করল ফ্রয়েডীয় থ্যানাটোস প্রকল্পকে। কিভাবে ?

ফ্রয়েডীয় থ্যানাটোস প্রকল্পে প্রথম আঘাত হানেন ভিলহেল্ম রাইখ। রাইখ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সদস্য ছিলেন না, ছিলেন একই সঙ্গে মার্কসতাত্ত্বিক এবং ফ্রয়েড-বিজ্ঞ ; মার্কসতত্ত্বের সাহায্যে তিনি ফ্রয়েডীয় প্রকল্পদের সমাজজীবনে আনার প্রথম দুঃসাহসিক কর্তব্য পালন করেন। তিনিই প্রথম ফ্রয়েডীয় মৃত্যু-ইচ্ছার বিরোধিতা করেন আর সেই বিরোধ থেকে রাইখের প্রকল্পকে গ্রহণ করল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল, সেখান থেকে স্কুল ফ্রয়েডের আরো গভীরে প্রবেশ করল এবং ফ্রয়েডের সঙ্গে বিরোধ বাড়ল আরো ; যে বিষয়ে এই বিরোধ চূড়ান্তে পৌঁছেছিল সেটাই এখন আমাদের যাত্রাবিন্দু : বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ। অতএব শুরু করছি রাইখ থেকে।

জীবন মানে খানিক ধ্বংস, যেমন ক্যাটাবলিজম যেমন কোষের ক্ষয়—জীবনোপযোগী প্রতিটি পদ্ধতিতে ধ্বংসের স্পষ্টতা : জীবন মানে একথা সর্বতো সত্য, রাইখ এই প্রবণতার নাম রাখলেন destruction drive। খুবই স্বাভাবিক একেকটা মানুষ যখন জীবনই, তাদের মধ্যে destruction drive থাকা স্বাভাবিক এবং হয়তো এই drive-টাই সমাজ জীবনে কুখ্যাত আকাঙ্ক্ষার রূপ নিয়ে থাকবে ; সমাজ

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কলুষ-কল্মষ-বিরোধ-বিদ্বেষ আনবে এই drive : অনুমান করেন রাইখ। এবং drive-টা আদিতে যেমন ছিল, একটা জীবন কি একটা কোষসমাহারে যা ছিল, তা নিশ্চয়ই থাকবে না, একটু নতুন হবে ; এই সীমাতিক্রম্য ছবিতে ফ্রয়েড পেলেন প্রবৃত্তিগত (instinctual) প্রবণতা কিন্তু রাইখ পেলেন আহৃত (derivative) ব্যাপার ; রাইখ দেখলেন ধ্বংসবৃত্তি মূলে নয়, মূলে আছে ইরোসই, সেটা থেকে আহৃত হয়ে থ্যানাটোস জন্ম নিচ্ছে। কিভাবে বুঝলেন সেকথা ?

রাইখ বলছেন আমার আদিতে ইরোসই বিদ্যমান, ইরোস সুখনীতির বশে নির্গত হয় এবং বাস্তবনীতির বশে নির্গত হয় এবং বাস্তবনীতির সাথে তার দ্বন্দ্ব ঘটে। সমাজ-জীবন ব্যক্তির সব ইচ্ছা মেনে নেয় না, যার অর্থ হল ইরোসের অবদমন ঘটে। এই অমদমিত ইচ্ছাটাই, রাইখের মতে, আগ্রাসনের জন্ম দিয়ে থাকে। অর্থাৎ ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা তথা থ্যানাটোস আদি থেকে উত্থিত নয়, পরিবেশের হতাশব্যঞ্জক আদি-ঋণাত্মক দৃষ্টি-বীক্ষার ফলে জাত এবং আদি ইচ্ছা তথা ইরোসের সিদ্ধান্তকৃত বস্তু হিসেবেই জাত।

শুরু করে দিলেন রাইখ। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এটুকুই শুধু চাইছিল। তারা দেখেছে থ্যানাটোস যদি আদিতে থাকে তাহলে স্বপ্ন দেখা (অবশ্যই বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে) অসম্ভব। এ কথা সত্যি আমরা সবাই মরব, মরার ভয় থেকে বাঁচতে চাই তাও ঠিক কিন্তু মনের মতো বাঁচতে সাধ যায় না কি আমাদের ? সে সাধ সত্যিই থাকে, আর সেটা মারা যায় যদি থ্যানটোস মূলে থাকে। ওদিকে রাইখ দেখাচ্ছেন থ্যানাটোস মূল থেকে জাত, আহৃত মাত্র ; সেই যুক্তিটাকে গ্রহণ করল স্কুল ; গ্রহণের পর শুরু হল নিজস্ব মতধারার যাত্রা—ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এবার আরো গভীরে প্রশ্নটা ফেলল—কেন ফ্রয়েড থ্যানাটোসকে মূলে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন ? কোন অসম্পূর্ণতার কারণে ?

জ্ঞানের বিকাশ এভাবেই ঘটে। একটা জায়গায় জ্ঞান আটকে এলে এবং সেখান থেকে তার অহল্যাদশার উদ্ভব ঘটলে প্রশ্ন ওঠে জ্ঞান কেন ঠিক সেইখানে বদ্ধ ছিল, যেখান থেকে অথচ আগেকার কার্যকারণের গতি পাওয়া যেত। সে আটকে ছিল সে কেন আটকে ছিল সেটা জানলে যে তাকে আটকে রেখেছে তার সম্বন্ধেও জানা সহজ হয়ে যায় এবং সে জানা জ্ঞানের বিকাশের প্রয়োজনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বুঝে নিয়েছে ফ্রয়েডের থ্যানাটোস প্রকল্প একটা বড়ো ফাঁকি, বোঝার পর স্কুল আরো তীক্ষ্ণ হতে চেয়েছে : থ্যানাটোস প্রকল্পের অতবড় ফাঁকিটা কে সাজাল ? সেটা বুঝতে তৎপর হয়েছে এর পরের ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষণা।

৬

স্কুল দেখল ফ্রয়েড একটা বিশেষ অবস্থাকে ভুল বুঝেছেন, মানুষের বহুবিকশিত সেই অবস্থার নাম শ্রম, ফ্রয়েড শ্রমের ভূমিকাকে যথেচ্ছ নেগেটিভভাবে দেখেছেন, দেখার ফলে ফ্রয়েড মানবসমস্যাকে যৌক্তিক বাস্তবিকে বুঝতে পারেননি, পেসিমিষ্ট মতধারা এনে থ্যানাটোস প্রতিষ্ঠা করে মানবমুক্তির গোড়া কেটে দিয়েছেন।

ফ্রয়েডের এই ভুল বোধকে বোঝা যাবে ডারুইনের struggle for existence বুঝলে। Struggle for existence প্রকল্পে ডারুইন বলেছেন বাঁচার জন্যে প্রাণীতে প্রাণীতে সংঘর্ষ ঘটে এবং যে যোগ্য তারই বাঁচা নিশ্চিত হয়। হতে পারে সে সংঘর্ষ একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে ঘটে, অথবা বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে। ফ্রয়েড একে সরাসরি টেনে আনলেন শ্রম-সম্বন্ধিত-সমাজে, একবারও ভাবলেন না যে এই সংঘর্ষ ট্রানসেনডেন্টাল ধাঁচের অথবা গুণগত নতুনত্বের অপেক্ষারত এই সংঘর্ষ। ডারুইন যে সংঘর্ষের কথা বলেছিলেন সে লড়াইয়ের কালে শ্রম ব্যাপারটা চালু হয়নি, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার পর্ব চলছে, প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা চলছে না। আর ফ্রয়েড যখন থেকে কৌতূহলী তখন সমাজপ্রথা চালু হয়ে গেছে, শ্রম চালু হয়েছে, শ্রম দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করার স্বপ্ন ও বাস্তবতা হাতে হাত ধরে চলছে ; সেখানকার পরিবেশ অনুযায়ী শোষণ প্রথাও কায়েম হয়েছে, সংঘর্ষ হচ্ছে, কিন্তু এই সংঘর্ষ কি ডারুইন প্রবর্তিত সংঘর্ষের একই জাতে অবস্থান করতে পারে ? শ্রমহীন পরিবেশ আর শ্রমময় পরিবেশর সংঘর্ষ কি এক মাত্রায় সমীকৃত হবে ? হইয়ে দিয়েছিলেন ফ্রয়েড। ফলত শ্রম বিষয়টা যা হওয়া উচিত ছিল (যার অসাধারণ বিশ্লেষণ পাই হেগেল মার্কসে) তার চেয়ে বহুলাংশে খাটো হল ফ্রয়েডীয় শ্রম ধারণা। ফ্রয়েড ধারণাই করে নিলেন সাধারণ সংখ্যাগুরু মানুষ আনন্দ পেতে কাজ করে না, প্রয়োজনের তাগিদে এবং প্রয়োজনের উপদ্রবে শ্রম করতে বাধ্য হয়—অতএব শ্রমব্যবস্থার কারণে সামাজিক সমস্যা জন্ম নিতে থাকে।

ঘটনাটাকে ব্যক্তিক দিকে টানলেন ফ্রয়েড। ফ্রয়েডবাদ অনুসারে কোনো মানুষের মানসিক শক্তির পুরো কোটা সংরক্ষিত থাকে লিবিডো তথা ইরোসের জন্য। লিবিডোর কাজ হলো সুখস্তর থেকে নির্গত হওয়া এবং বাস্তব সমাজের মুখোমুখি হওয়া। ওদিকে বাস্তব সমাজের কাজ হলো সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে লিবিডোকে প্রশ্রয় দেয়া—খুবই স্বাভাবিক ইরোসের ইচ্ছারা সমাজ কর্তৃক সমর্থিত হবে না, সেক্ষেত্রে ঘটে লিবিডোর অবদমন, বাস্তবতার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা

ভোগ করে লিবিডো। এই একই নিয়ম যখন শ্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, শ্রম যখন পুরোপুরি survival for the fittest বা বাস্তবতার মুখাপেক্ষী তখন লিবিডো নিঃসরণ শ্রম দিয়েও বাধাপ্রাপ্ত হবে, কারণ লিবিডোর ইচ্ছা শ্রমের survival-জনিত ইচ্ছার একেবারে বিপরীতে। তাহলে পরিবেশটা এমনি হয় যে মানুষকে শ্রম করতেই হচ্ছে এবং লিবিডো যন্ত্রণা পেয়েই যাচ্ছে···মিলিয়ে দিলে ঘটে শ্রম যেন একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া। মানুষ কাজ করতে বাধ্য হয়, কাজকে একটা ক্রীতদাসত্ব ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

আর এই কথা মানল না ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। আবার অস্বীকারও করা গেল না ফ্রয়েডের যুক্তিসজ্জা। কর্মে-শ্রমে আনন্দ পাওয়া পুঁজিবাদী সমাজে অনুভব করা যদিও সাধ্যাতীত, সত্যিই যখন মেহনতী মানুষেরা আনন্দ সহকারে কাজ করে না, কাজ করতে বাধ্য হয়—তাহলে ফ্রয়েড নস্যাৎ হওয়া অসম্ভব। এদিকে আবার তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষক কার্ল মার্কস; শ্রমকে এত সুচারু দার্শনিক-অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ আগে কেউ করে উঠতে পারেননি—মার্কসকে মেনে নিলে শ্রমে আত্যন্তিক শুভ-সততা দিতে হয়, শ্রম ফ্রয়েডীয় জ্ঞানানুগ উৎপাত হতে পারে না।

অর্থাৎ ?

৭

একমাত্র একভাবেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মার্কসকে অস্বীকার করার প্রশ্ন আসছে না, আবার ফ্রয়েডীয় পেসিমিজম অর্থাৎ মানসিক হতাশা বাস্তব সত্য—তখন একটা মাত্র পথে ব্যাপারটার অমিল এড়ানো যায়; যদি ভেবে নিই শ্রম একটা প্রবৃত্তি (instinct অর্থে) যাকে বাস্তব নীতির দ্বারা ব্যাহত করলে শ্রম নির্লিপ্ততা ও দায়বদ্ধ কাজের জন্ম হবে, যাকে sublimated ফর্মে আনতে পারলে ···রবীন্দ্রনাথ বলে দেন: আমরা চাষ করি আনন্দে। তখনি সমস্যা মেটা সম্ভব।

শ্রমকে instinct ধরে নেয়া স্কুলের প্রথম বিশিষ্টতা, এই একটা কাজে স্কুল ফ্রায়েডোর্ধ্বে যাবার সাহস পায়, মার্কস মতবাদের খুঁত নির্মূল করার হাতিয়ার পায়। এরপর থেকে স্কুলের এই মাত্রিক গবেষণার দায়ভার বর্তায় হার্বার্ট মার্কুসের ওপর, বাকী কাজগুলো (আমাদের বিচ্ছিন্নতা বিশ্লেষণও) সারেন মার্কুস।

মার্কুস অধিকারবোধের ব্যাখ্যা দিলেন, মার্কুসের ওটাই বৃহৎ কাজ। আজকের সুচিত্রিত সভ্যতায় মানুষ মানুষের অধিকারে অধিকৃত, অধিকার বাস্তবায়িত হচ্ছে অর্থনৈতিক চক্র মারফৎ কিন্তু অধিকার যে প্রক্রিয়ায় মানসিকবোধে জেগে উঠছে

তার পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প সাজালেন মার্কুস। তাঁর *Eros and Civilization* কি *An Essay of Liberation* সেই অধিকার বিস্তারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ—সেখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব বিচ্ছিন্নতা আসছে কেমন করে। বোঝার সুবিধাতে আমরা প্রথমে দেখব মানসিকভাবে অধিকারবোধ কেমন করে জন্ম নেয়, সেখান থেকে বিচ্ছিন্নতার মহাকাব্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

মার্কুস মেনে নিলেন ফ্রয়েডীয় সুখানুভূতি আর বাস্তব নীতির দ্বন্দ্বটা সঠিক—তবে ইদ্‌ইচ্ছা সম্বন্ধীয় ফ্রয়েডীয় ধারণা ঠিক নয়, ফ্রয়েডীয় ইদে ইরোস ও ফ্যানাটোস ছিল, মার্কুস বললেন ইদে ইরোস আছে এবং শ্রম বোধ আছে। ইরোসের কাজ সুখ ও তৃপ্তি লাভ করা, শ্রমের কাজ সুখনীতিকে প্রতীয়মান করা। শ্রম একটা উল্লেখযোগ্য প্রবৃত্তি, শ্রম যেমন: Man begins working because he finds pleasure in work, not only after work, pleasure in the play of his faculties and the fulfilment of his life not as the means of life, but as life itself man begins the cultivation of nature and of himself, co-operation, in order to secure and perpetuate the gaining of pleasure (Five Lectures থেকে নেয়া)। মনে আনা যেতে পারে ফ্রয়েড play সম্বন্ধে ঋণাত্মক ধারণা নিয়েছিলেন, *Beyond the Pleasure Principle*-এ তিনি play শব্দকে unpleasurable লিখেছিলেন। আর মার্কুস play শব্দে পজেটিভ মূল্য আরোপ করে ফ্রয়েডের ওপর যাবার চেষ্টা করলেন; শ্রম স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি হিসেবে পণ্য হল এবং ইরোস যেমন বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে অসুস্থ হতে পারে; শ্রম তেমনি অন্যের মর্জি আদেশ নিগ্রহের প্রভাবে ঐতিহাসিক যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা পেতে পারে—যদিও আদিতে শ্রম, ইরোসের মতোই, সুখবোধ নিশ্চিন্তির সাক্ষরতা। মার্কুস ঘটনাটাকে এভাবে দেখলেন, সমস্যার মীমাংসা বুঝি বা ঘটল, ফ্রয়েডোর্ধ্বে যাবার নিশ্চয়তাও ঘটল।

এর পরের ঘটনা কৌতূহলোদ্দীপক। মার্কুস মনে করে নিচ্ছেন লিবিডো যৌনতৃপ্তির জন্য প্রকাশ পেতে চায় ও সমাজ বাস্তবতা তাকে সবসময় মেনে নেয় না এবং যৌনতার বিকল্পে শ্রম প্রকাশ পায়, প্রকাশ ঘটে (desexualized অর্থে) রীতিতে, বি-যৌন আত্মপ্রকাশ ঘটে লিবিডোর। যৌন পথে অবরুদ্ধ হয়ে এই যে যৌনতাচ্যুত প্রকাশ মেনে নিচ্ছে লিবিডো তার একটা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনুভব করবে লিবিডো, সেটা জ্বালা যন্ত্রণার হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক—desexualized শ্রম তাই বেদনাদায়ক ঠেকে এবং সমাজ সেটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার

ঘটায় : শোষণ করা এবং আঘাত দেবার জায়গাটা খুঁজে পায় সমাজ। বিপরীতে, সমাজ মানুষকে যে শ্রমকেন্দ্রিক শোষণ করার সাহস রাখছে, সে সাহসটা সমাজ পাচ্ছে কোথা থেকে ? মার্কুস থেকে বলা যায় শ্রম যেহেতু বি-যৌন পদ্ধতির ফসল এবং কিঞ্চিৎ অপ্রেমের—তাই সেখান থেকে আঘাত দেবার সুযোগ নিয়ে নেয় সমাজ।

আরেকটা কথা বোঝা বাকী। মার্কুস থেকে বুঝতে পারছি শ্রম desexualized পদ্ধতি বলে তার আদিতে একটা যন্ত্রণা আছে যেমন ফ্রয়েডতত্ত্ব থেকে মনে করা যেতে পারে মানুষের মধ্যে ভয়বোধের শুরু সেই জঠরচ্যুত হবার ভয়াল কাটা ছেঁড়ার অভিজ্ঞতা থেকে। এটা বোঝা হলো। এটা বুঝলে এই বোঝা যায় যে আমার যন্ত্রণা বা জ্বালার ইতিবৃত্ত খুঁজে পেতে পারি। সর্বহারার মানসিকতা সেখান থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বুর্জোয়া মানসিকতা ? শোষণ করার মানসিকতা ? যন্ত্রণা দেবার মানসিকতা ? অধিকার করার মানসিকতা ? সে-সব কিভাবে আসছে ?

মার্কুস দেখালেন সুখানুভূতি আর বাস্তবতার দ্বন্দ্ব যেমন একরকম desexualized শ্রমের দিকে নির্গত হয়, তেমনি আরেকভাবে return to the womb পর্যায় ঘটে। যখন বহির্দুনিয়া অসহ্য হয়ে ওঠে, কিছুতেই আর সামাল দেয়া যায় না—তখন জঠরে নিমজ্জিত হবার প্রবণতা দেখা যায় ; যার অর্থ হল মৃত্যু-ইচ্ছার জন্ম। মার্কুস-মতে মৃত্যু-ইচ্ছা আদিতে ছিল না, ছিল ইরোসই ; ইরোস বহির্দুনিয়ার চাপ সামলাতে না পেরে মৃত্যু-ইচ্ছা কি ধ্বংসাকাঙ্ক্ষার দিকে চলে যায়। এভাবেই জন্ম নেয় থ্যানাটোস।

এই সমাজের যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারি সুখ আর বাস্তবতার দ্বন্দ্ব ঘটে যাচ্ছে অর্থাৎ তার মধ্যে জাগ্রত থাকছে ইরোস শ্রম এবং মৃত্যু-ইচ্ছা। এই ব্রহ্মস্পর্শে টানটান সেই মানুষ কিভাবে সমাজে চলতে সক্ষম হবে, এই তিনটে ভেক্টরিয় টানকে সে কিভাবে ও কোন পথে চালিত করতে পারবে ?

তাকে দুটো কাজ করতে হয়। যদি বাঁচার মতো বাঁচতে হয় তাহলে তাকে দুটো অভ্যাসে আসতে হবে। হয় তাকে থ্যানাটোস সামাল দিতে হবে, নাহয় তাকে থ্যানাটোসের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে—দুটো একভাবেই সম্ভব, যদি শ্রমকে মাঠে নামানো যায়। অর্থাৎ, মারাত্মক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই ; থ্যানাটোস থাকছেই—থ্যানাটোস মারা যাচ্ছে না কি থ্যানাটোস থেকে সারাইম করা হচ্ছে না এবং যথাবিহিত শ্রম যেমন আগে তেমনি পরে।

তার মানে শোষণ করার মানসিকতা থাকছেই কারণ থ্যানাটোস থাকা মানে

শুধু আত্মধ্বংস নয়, ফ্রয়েডীয় ভার্সানে থ্যানাটোস আগ্রাসনের কথাও বটে। যখন সুযোগ থাকছে দুর্বল কারোকে হাতের কাছে পাবার তখন আমি শোষক ; অন্য দিকে অন্যের তুলনায় নিজেকে যখন বলশালী মনে হচ্ছে না (অথবা বাস্তবে তা নয়ও) তখন শোষিত মানসিকতায় বিশ্বস্ত হচ্ছে এক মানুষ।

গড়ে উঠছে শোষক-শোষিতের মানসিক ইতিহাস।

৮

এবার আসবে বিচ্ছিন্নতার আলোচনা। মনে রাখতে হবে বিচ্ছিন্নতা মার্কুসে মৌল বিষয় ছিল না, মূলে ছিল অধিকারবোধ ও তার মুক্তিবিশ্লেষণ। যেমন মার্কসের মৌল গবেষণায় ছিল অর্থনৈতিক শোষণ এবং তার অবসান-সংগ্রামের বলিষ্ঠ কাহিনী : যদিও এ কাজে মার্কস বিচ্ছিন্নতাকে গভীর নিউক্লিয়াসে প্রোথিত করেছিলেন বলে মনে করা হয়, তেমনি মার্কুস কেন্দ্রে রেখেছিলেন সুখনীতি ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে যার একটা বড়সড় ফলন হল বিচ্ছিন্নতা। সেই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে এবার আলোচনা এগোবে।

মানসিক রাজ্যে শোষক-শোষিতের জন্মবৃত্তান্ত, যদি সুখ বনাম বাস্তবতা দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখান যায় (যা মার্কুস করেছিলেন), অন্যদিকে অর্থনৈতিক রাজ্যে যদি শ্রম বিভাজনকে শ্রমেরই নতুন প্রয়োগীয় পদ্ধতি বলে বোঝা যায় (যা মার্কস করেছিলেন) তাহলে দুটোর মিশ্রণে খুব সহজে বোঝা যায় শ্রমবিভাজন ঘটলে শোষণের চাকা গড়াতে শুরু করবে, একজন দ্বারা অন্যজন অধীকৃত হতে থাকবে। আমরা এইখান থেকে শুরু করব।

শ্রমবিভাজন যত বাড়বে তত বাড়বে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর আয়তন—শোষক ও শোষিতের সংখ্যা এবং মাত্রা বাড়বে দ্রুত বেগে ; যে শ্রম করছে সে শ্রমশক্তি বিক্রয় করার পরিসরে আত্মশ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তায় নির্বাসিত হচ্ছে, অন্যদিকে যে শ্রম করছে না এবং শ্রমশক্তি ক্রয় করার অধিকার পাচ্ছে—সেও শ্রম থেকে এবং শ্রমসংক্রান্ত শ্রদ্ধা থেকে চ্যুত হচ্ছে আরো বেশি, হয়ে যাচ্ছে শোষক, যেমন অর্থনৈতিকে তেমনি মানসিকতাতে।

অর্থাৎ শ্রম এখন আত্ম'র জন্য নয়, বিচ্ছিন্ন জগতে কতিপয়ের স্বার্থ চরিতার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এই শ্রম, লিখছেন মার্কুস : It is with a new ease that terror is assimilated with normality, and destructiveness with construction. Still, progress continues, and continues to narrow the basis

of repression. At the height of its progressive achievements, domination not only undermines its own foundations, but also corrupts and liquidates the opposition against domination. What remains is the negativity of reason, which impels wealth and power and generates a climate in which the instinctual roots of the performance principle are drying up.

শ্রম যে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন শ্রমে রূপান্তরিত হচ্ছে সে কথাতেই শেষ নয়, শেষ কথা হচ্ছে শ্রম লিবিডোকে অধঃপাতে যেতে দিচ্ছে—আট ঘণ্টা শ্রমশক্তি বিক্রয় করার পর সেরে মানুষের কাজ থাকে আগামী আট ঘণ্টা মাপের শ্রমশক্তি তৈরি করার জন্য খাদ্য আহার বিশ্রাম নিদ্রা এবং আট ঘণ্টা মাপের ফুর্তি যথা টিভি মদ্য পান : নিজেকে নিয়ে বসার সময় সে পাচ্ছে কই? আট ঘণ্টার ফুর্তিটাকেও সমাজ নিজের অধীনে রেখে দিয়েছে; বিনোদন তখন আমার এক্তিয়ারে থাকছে না, বিনোদন বর্তমানে দূরদর্শন নাটক সিনেমা পানশালায় নিমন্ত্রিত, যার সবটাই নিয়ন্ত্রণ করছে শোষণকামী সভ্যতা—আমি কি আমার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছি? পারছি না এবং এটাই সূচনা করছে আত্মবিচ্ছিন্নতার।

দার্শনিকভাবে এই বিচ্ছিন্নতার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন সার্ত, কিছুটা দর্শন কিছুটা মনোদর্শন মিশিয়ে বিচ্ছিন্নতার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন হর্ণি, শাণিত মনোদার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে এবার উদ্যত হন মার্কুস।

মার্কুস দেখছেন লিবিডো সম্প্রচারে বাধাই শুধু ঘটাচ্ছে না, সুখানুভূতিকে বাতিল করার কুকর্মও সংঘটিত হচ্ছে এই শ্রমবিভাজিত সমাজে, সুখানুভূতিকে নস্যাৎ করার অর্থ ই হলো আগ্রাসন থ্যানাটোস অধিকার-অধিকৃত বোধ। অর্থাৎ শুষে যাচ্ছে সুখনীতি, খরা মরুর আকার নিচ্ছে সুখনীতি। অর্থাৎ আমি'র অভ্যন্তরের রসটাই যাচ্ছে মারা, যার মানে আরো ভয়াবহ—আমার সে বোধটাই থাকছে না যার সাহায্যে তুলনা করে দেখব আমার বাহ্যিক অসহায়তাকে। এখানে আর গাভীর মতো মেঘ চড়বে না, এখানে আর ডাক দিতে পারব না কোনো অবনীকে, অবনী বাড়ি আছে কি না সে প্রশ্ন হয়ে যাবে প্রলাপ মাত্র কারণ অবনী বলে কিছুই যে আর থাকছে না।

এক ভয়াবহ পরিস্থিতির অস্তিত্ব ডেকে আনলেন মার্কুস। মার্কস দেখিয়েছিলেন শ্রম শ্রদ্ধার ভূমিকায় সবসময়ই জীবন্ত থাকবে যদিও সমাজ অর্থনীতির নিষ্পেষণে শ্রম বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে মার্কুস দেখছেন সমাজ অর্থনীতির

নিষ্পেষণে আমি'র আমিত্ব আমি'র যাথার্থ আমি'র আদি ইচ্ছা মারা যাচ্ছে, মারা গেলে যে আমিত্ব-বর্জিত কাঠামোটাই পড়ে থাকবে যাকে সমাজ যাইচ্ছেতাই ব্যবহার করবে : আমি শোষিত হচ্ছি সেটাই যে বুঝে উঠতে পারব না কারণ যে নিক্তি দিয়ে শোষিত হওয়া কি হতাশা কি হতভাগ্য দশা মাপতে পারতাম সেটাই যে থাকছে না—মননহীন যান্ত্রিক মানুষ ছাড়া আমার আর কোনো পরিচয়ই যে থাকবে না। রোবট যেমন প্রশ্ন করে না কম্পিউটার যেমন প্রশ্ন করে না, তেমনি ঐ একই ভাবে, কোন প্রশ্ন তোলার মানসিকতাই আমার থাকবে না, মার্কুস দেখছেন নয়া-বিভীষিকা বুঝি-বা জন্ম নিতে চলেছে।

সত্যিই কি সমাজ, আজকের সমাজ, আজকের সাম্রাজ্যবাদী সমাজ, আজকের শোষণসর্বস্ব সমাজ দীর্ণ জীর্ণ লেহিত চর্বিত তৃতীয় বিশ্বের ব্যক্তিমানুষকে এই পর্যায়ে ফেলছে না? ফেলছে। শিল্পসাহিত্য রাজনীতি-অর্থনীতি বিজ্ঞান কলা সংস্কৃতি··· প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মকে শুকিয়ে দেবার একটা সুনিপুণ প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের সার্ত ছিলেন মার্কস ছিলেন, ছিলেন বলেই তাঁদের তেজে তেজোদীপ্ত হয়ে আমরা ক্যামুকাফকাদের নির্বিচার তুলোধোনা করতাম (অবশ্যই শ্রদ্ধাসহকারে), আজ যে ক্যামুকাফকাও থাকছেন না; মামাভাগ্নীর নীললোহিত চাহনিচুম্বনচুলকুনিতে তুষ্ট থাকতে হচ্ছে আমাদের, কোথায় গেলেন সেই দস্তয়েভস্কি; তাঁরা না থাকলে মার্কস-লেনিনের কল্পনা করার কল্পনাও যে করে উঠতে পারি না।

৯

তবে কি মার্কুস খাবিখাওয়া সুখনীতির সন্ধানে ইদে ফিরে যাবার কথা বলবেন? ফিরে যেতে বলবেন চরকাকাটা আর সমুদ্রজল জাল দিয়ে নুন বানাবার জগতে? না। মনে রাখতে হবে মার্কুসের সামনাসামনি তখন ছুটো মর্মভেদী প্রতিভা (অবশ্যই পারস্পরিকে দুর্বোধ্য!)—মার্কস এবং ফ্রয়েড; এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল নতুনত্বের সন্ধানী হয়েছিল মানবমুক্তির জন্য—মার্কুস মানবমুক্তির অনুসন্ধানে ফ্রয়েডনির্ভর sublimation আর মার্কসনির্ভর revolution-কে ব্যক্তিক মাত্রাতে মিশিয়ে দিয়ে বললেন abolition দরকার, reactivation নয়; লিখলেন : The theory of alienation demonstrated the fact that man does not realize himself in his labor, that his life has become an instrument of labor, that his work and its product have assumed a form and power independent of him as an individual. But

the liberation from this state seems to require, not the arrest of alienation, but its consummation, not the reactivation of the repressed and productive personality but its alienation. The elimination of human potentialities from the world of (alienated) labor creates the preconditions for the elimination of labor from the world of human potentialities.

আলোচনা এখানেই শেষ। বিচ্ছিন্নতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখানো ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। যে বিচ্ছিন্নতা জীবন্ত ও দাহদগ্ধ তাকে তেমনি ভাবে রাখা অর্থাৎ উত্থিত বিষাদের বিকল্পে তারুণ্যময় হওয়া যখন আমাদের নীরন্ধ্র প্রাপ্য ও প্রয়োজনে ছিল তখন sublimation কিভাবে সে কথার দীর্ঘকথন অনুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় ও যতির দিকে কলম টান্‌টান্‌ হতে উদ্‌গ্রীব থাকে—এখন শুনতে থাকি কখনো কারোর কাছে পাঠানো রুপোলি কবিতা ; বিষাদের নিদাঘ রৌদ্রে আজ রথ প্রস্তুত, সারথিও, শুধু বলার প্রতীক্ষা :

একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
শতাব্দীর পুনঃ পুনঃ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে
তীব্র প্রসব ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি নবজন্ম কাঁপে থরো থরো
জয়ধ্বনি করো ॥

আনন্দ ঘোষ হাজরার কবিতা

গৌতম গুপ্ত

আনন্দ ঘোষ হাজরার সাম্প্রতিক কবিতায় এক নতুন উত্তরণ লক্ষ করি। আজ প্রায় দেড় দশক তার কবিতা আমাদের বিশেষ মনযোগের কেন্দ্রে রয়েছে। আনন্দর কবিতা কখনই তেমন উচ্চনাদি নয়, নয় ছন্দ প্রকরণ খেলার অনাবশ্যক অট্টরোল। এক স্নিগ্ধ শীলিত মাধুর্য সবসময়ই তাঁর কবিতাপুঞ্জকে ঘিরে থাকে।

সম্ভবত ষাটদশক থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেছেন। তখন যে সব কবিতা চোখে পড়ত ছন্দনির্মাণে, বক্তব্যে তা সুষম হলেও কোনো অন্যপূর্ব বিশেষ ইঙ্গিত কোনো মৌলিক বিস্ফার তেমন করে নজরে পড়েনি। মাঝখানে বেশ কিছুদিন তাঁর কবিতা তেমন চোখেও পড়ত না। কেমন যেন গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। এই কবিতাগুলি পাঠ করে বোঝা গেল সেই আপাতত নীরবতা ছিল অন্য এক আরম্ভের জন্য। বিস্ময়ের জন্য।

বলতে বাধা নেই নতুন এক কবিতাগুচ্ছে নিজেকে আত্মপ্রাপ্ত বদলে নেওয়া আনন্দ আমাদের আপ্লুত করতে পেরেছেন। এক তীব্র ঘোর, এক গভীর কবিত্বের স্বাস্থ্যবান আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কবিতাগুলি। কোনো ভণিতা নেই, নেই কোনো বিশেষণ বিশেষ উপমার তিলমাত্র অসম প্রয়োগ। এ যেন এক নতুন আনন্দ। আমাদেরও, সম্ভবত পাঠকরাও, কবিতাগুলি পড়ে যা অনুভব করবেন তার নামও আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ।

ট্রান্সমিটার

সে একটা নামহীন প্রবাহহীন ধূসর সমুদ্রের মাঝখানে ডিঙি নৌকোর ওপর ভাঙা রেডিও ট্রান্সমিটার। প্রয়োজনহীন যন্ত্রবৎ। আকাশ এখন তার সত্ত্ব নিয়ে, উজ্জ্বল চিত্রমালা নিয়ে, তার দিকে নেমে আসে না। ফসল আলবাল মাঠ ও মানুষ তার দিকে প্রেরণ করে না তরঙ্গমালা। একটা কঠিন লৌহবলয়ের চাকায় ঢেকে গেছে নভস্থল, নক্ষত্রমণ্ডলী। নিরন্তর বজ্রবলয়ের ঘর্ষণে উড়ছে স্ফুলিঙ্গ। উত্তপ্ত বাতাসের ঝড় তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে অরণ্যপতনের মুহুর্মুহু শব্দ। অথচ মাঝে মাঝে সে এখনও দেখতে পায় ক্ষীণ আলোকরেখায় রমণীমূর্তি। উজ্জ্বল নদীর জলে তারা স্নান সেরে উঠে আসছে। কোন দূর অন্ধকার করিডর থেকে কর্তৃত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে শব্দ, ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট। যন্ত্রের পাশে পিছনে সামনে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে এই সব শব্দগুলি। গভীর শ্রুতির মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে, ধ্বংসপ্রবণতার দিকে মিলিয়ে যেতে যেতে, অশনিসম্পাতের ভয়ঙ্কর শব্দ ও

উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে পুড়ে যেতে যেতে, সেই ভাঙা ট্রান্সমিটার চীৎকার ক'রে উঠতে চাইছে—'আমি···এখানে···'।

শব্দ

কেমন ধীরে ধীরে কংক্রীটের আচ্ছাদনে ঢেকে নিচ্ছি সত্তা, মন, অবয়ব! অর্ধ-দেহ প্লাস্টার করা হয়ে গেলে বাকিটা ক'রে দেয় বন্ধুরা। তার আগে বানিয়েছি আলোকবঞ্চিত ঘর। দেওয়ালপ্রহত হয়ে ঘরের বাইরে বেজে উঠছে বাতাস। ঘরের ভেতরে যাওয়াও যা, ঘর থেকে ফিরে আসাও তাই। ঘর থেকে ঘরে, ঘর থেকে ঘরে অর্থাৎ একই ঘরের ভেতর ছিল আমার যাতায়াত। এখন সেই ঘরেই প্রস্তর-মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকব। তবু পাথরে পাথরে শাখায় শাখায় বাজবে বাতাস নদী আর আলোকমৃদঙ্গ; অনাদিকালের ঘোরনাদের টুকরোগুলো রণিত হতে থাকবে বাইরে এবং ঘরেও; কংক্রীটের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যেও এবং আমার রক্তেও। কখনও প্রসারিত হবে শব্দ, কখনও ভেঙে যাবে, কখনও উল্লসিত হয়ে উঠবে, কখনও হয়ে উঠবে গান, ক্রোধ আর ভালোবাসা। দেড় হাজার কোটি বছর আগে ফেটে যাওয়া ঐ ভয়ঙ্কর শব্দের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি না কিছুতেই।

পিতৃহত্যা

আকাশের শাদা হাড় ছুঁয়ে নেমে কতিপয় তীক্ষ্ণ কাক
ঘিরে নেয় আমার শরীর;
মৃত ইঁদুরের মতো সবুজ ঘাসের লনে এতক্ষণ শুয়ে আছি দেখে
আমার বিবর্ণ চোখ শরীরের মাংস সব ছিন্নভিন্ন দেখে
মগজ ঠুকরে খায়—মগজের শাঁস, গন্ধ, গান—
মাথার ভিতরে আর গান নেই
গান নেই রাজপথে, আলবালে, ফসলে, জ্যোৎস্নায়;
কংক্রীটের মতো কোনো ভবিষ্যের আড়ালে দাঁড়িয়ে
আমার সন্তান দেখে, আমার সন্ততি দেখে
স্বাভাবিক পিতৃহত্যা।
অথচ তাদের কোনো ক্রোধ নেই, অনুভূতি নেই
অথচ তাদের চোখ কংক্রীটের আড়ালে নির্বোধ

যেন কোনো প্রত্যাশিত মৃত্যুর নাটক
থিয়েটার-হলে ব'সে সকলেই দেখে যাচ্ছে
কিছুক্ষণ পর—
সবই ঠিকঠাক হয়ে যাবে, যেন শেষ দৃশ্যটুকু
এতক্ষণ বাকি ছিলো ব'লে শুধু থাকা

কতিপয় কালো কাক, তীক্ষ্ণঠোঁট, মগজের শাঁস, গন্ধ, গান···

খেলা

এখন একটাই খেলা এইখানে, তুমিও খেলবে।
নিদাঘসন্ত্রস্ত দিন—
তৃণ নয়, শমীবৃক্ষে রেখে দাও তোমার শরীর, অনেকের···

যে নামাবে সে এখনও দৃশ্যপটে নেই।

নচিকেতা

এই যজ্ঞে কার কাছে আমাকে দিয়েছ?
তার গৃহে অতিথিশালায় কতদিন?
সে কি আর ফিরে এসে বলবে, 'নাও—
পাদ্য অর্ঘ্য নাও
হে ব্রাহ্মণ, এতকাল অভুক্ত রয়েছ!'

শস্য

লক্ষ যোজন দূর থেকে আসে অদ্ভুত অনন্ত উচ্চারণ
মনুষ্যপ্রতিম; প্রত্নছবির মতন কোনো বিস্মৃত গুহার
আলোকবর্তিকা যেন।

মনে রাখা ভালো এই পরিশ্রম, সফলতা, বিফলতা সব
আমাদের জন্য নয়···

তাহলে শস্য তুমি কার? কোন পরিণামী মানবতা?

শারীরিক

ছিল ধনুর্বাণ ছিল তীর
প্রয়োগশৈথিল্য ছিল যদিও বা পরিপূর্ণ তূণ

এবং নক্ষত্রফল পরিণামে অস্ত যায় দিগন্তরেখায়
সময় বেঁধেছে বাসা ততদিনে শরীরে আমার।

জলক্ষয়

গোপন আবর্তক্ষতে ধীরে ধীরে রুগ্ন হয় মাটি
এই গূঢ় জলক্ষয় লেহন করেছে ভিত্তিমূল

বাড়ি ভাঙে, বাড়ি ভেঙে যায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনে টেলিভিশনের অভিঘাত

কেতকী কুশারী ডাইসন

১

কিছু ব্যক্তিগত কথা দিয়ে এই আলোচনাটি শুরু করতে বাধ্য হচ্ছি। কেন, তা একটু পরেই প্রতিভাত হবে।

ব্রিটেনে সংসার পাতার পর বহু বছর যাবৎই টেলিভিশন খরিদ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। যতদিন ছেলেরা আসেনি ততদিন কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। পিছনে তাকিয়ে এখন বুঝতে পারি যে, ছেলেদের বয়স যখন ছিলো তিন-চার সে-সময়ে এই সমাজে, যেখানে ঘরের কাজে বা ছেলে-ভোলানোর ব্যাপারে বাইরের সাহায্য পাওয়া দুষ্কর, টেলিভিশন নামক যন্ত্রটির কাছ থেকে আমি কিছু মূল্যবান সাহায্য পেতে পারতাম। ঐ বয়সের শিশুদের জন্য বি-বি-সি টেলিভিশন ভারি সুন্দর-সুন্দর অনুষ্ঠান করে। শিশুদের ঐ সব অনুষ্ঠানের সামনে বসিয়ে দিয়ে মা তাঁর হাতের কাজ খানিকটা এগিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সে-সময়ে আমরা টেলিভিশন কিনিনি; হয়তো সেটা বোকামিই হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে ছেলেরা যখন নার্সারি স্কুল ছেড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করলো তখন তারা ঘরে আনতে লাগলো তাদের সমাজের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান টেলিভিশন-সম্পর্কে জরুরি যত খবর। কিছু দিনের মধ্যেই সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারা বুঝে গেলো যে, টেলিভিশন-নামক বস্তুটির মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার রকমের হুল্লোড়। তাদের খেয়াল হলো যে, ক্লাসের আলাপ-আলোচনার একটি প্রধান বিষয়বস্তুই টেলিভিশনে দেখা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, এবং তাদের বাড়িতে একটি সেট না থাকায় ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করার আনন্দ থেকে তারা নিদারুণভাবে বঞ্চিত। এই উপলব্ধি সব থেকে বেশি মর্মাহত করলো আমাদের বড় ছেলেকে; টেলিভিশনের অভাবটা সে অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করলো, এবং আমরা তাকে কিভাবে বঞ্চিত করছি সে-সম্বন্ধে নিত্য গীত গাইতে লাগলো। রোজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সে কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি যাবেই যাবে, টেলিভিশন দেখতে।

যেতোও। না যেতে দিলে মেঝেতে শুয়ে কাতর কান্না : 'সকলের টেলিভিশন আছে, শুধু আমাদের নেই।' প্রায় রোজই তাকে দেখা যেতো অন্যের দোরে কড়া নাড়তে। সঙ্গে যেতো ছোটজনও। দাদা পাশের বাড়ি গেলে কোন্ ছোই ভাই সঙ্গে যেতে না চাইবে? এরকমভাবে কিছুদিন চলার পর আমাদের অগত্যা আপস করতে হলো। সৌভাগ্যক্রমে মাত্র বিশ পাউণ্ডে একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড টেলিভিশনের অধিকারী হয়ে গেলাম আমরা, এবং বাড়িতেও খানিকটা শান্তি এলো।

সেই সেটটি এখনও বিকল হয়নি, দিব্যি চলছে, এবং আমাদের পারিবারিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তার প্রভাব, তজ্জনিত লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখবার সময়ও এসে গেছে।

এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, আজকের যন্ত্রশিল্পনির্ভর সমাজগুলিতে টেলি-ভিশন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের কোঠায় উন্নীত এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। তথাকথিত অনগ্রসর দেশগুলিতেও তার প্রভাব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। টেলিভিশন থেকে নাগরিকেরা আহরণ করে তাদের প্রমোদ, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে খবরাখবর, সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডারে নানান অনুপুঙ্খ, একাধিক ঘরোয়া সমস্যার সমাধানপদ্ধতি, বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং জীবনের নানান ব্যাপারে গ্রহণীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ইডিওলজির বিকিরণ যেসব দেশে একান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন সমাজবাদী দেশগুলিতে, বা সামরিক একনায়কত্বের অধীন দেশগুলিতে, সেসব দেশে টেলিভিশন রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সোভিয়েত দুনিয়ার বা চীনের টেলিভিশন তাদের সরকারের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখতে পারে না।

এখানে কেউ কেউ স্পষ্ট তর্ক তুলতে পারেন যে, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রে'র টেলিভিশন ব্যবস্থাও, হোক না তা সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, তার সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথিবীকে দেখে। নিশ্চয়ই দেখে, কিন্তু গণতন্ত্র যেহেতু চিন্তার স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে বিশেষ মূল্য দেয়, সেহেতু একটা প্রাথমিক উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতাও তার সামাজিক দৃষ্টিকোণেরই অন্তর্গত। অতিকায় মতৈক্য ও মতবৈচিত্র্য, এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ অবশ্যই আছে। কেউ যদি বলেন, 'এটা আমার মত; অমুক মুনি একথা বলে গেছেন, এবং তাঁর প্রতিটি কথা অভ্রান্ত; এটা শাশ্বত নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত; যে আমার মতের বিরুদ্ধে সে সন্দেহজনক ও বিপজ্জনক ব্যক্তি', তাহলে শ্রোতার মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু কেউ যদি বলেন 'এটা আমার মত; অমুক মুনি অবশ্য অমুক কথা বলে গেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই, এই এই কারণে; এ বিষয়ে আপনার কি মত?' তাহলে আমরা উৎসুক হয়ে বক্তার দিকে তাকাই এবং স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করি। মুক্ত দুনিয়ার টেলিভিশন সম্পর্কে এটা মানতেই হয় যে, তা আলোচনাপ্রিয়, যে কোনো বিষয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা তার প্রিয় কাজ; এবং অন্তত আমার তো মনে হয় যে, একদেশদর্শিতা অপেক্ষা বহুমুখী আলোচনার মাধ্যমেই যাথার্থ্যের হদিশ পাওয়া সুকর।

অবশ্য তার মানে মোটেও এ নয় যে, অবাধ স্বাধীনতা বলে মানুষের জীবনে কিছু আছে। নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা, এ দুয়ে মিলেই সামাজিক মানুষ, এবং সে পথেই সভ্যতার অগ্রগতি হয়ে থাকে। তবে ঐ দুই উপাদানের অনুপাত কী হবে তা নিয়ে তর্ক চলছে, চলবে। মুক্ত দুনিয়ার টেলিভিশনেও কোনো কোনো ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। সে আলোচনায় পরে আসছি।

এখানে বলা দরকার যে, টেলিভিশন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা মুখ্যত বি-বি-সি-কে ঘিরে। কদাচিৎ 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেলিভিশন' বা সংক্ষেপে 'আই-টি-ভি'র অনুষ্ঠানও দেখে থাকি। তবে বি-বি-সি-ই বেশি দেখা হয়, কারণ একাধারে মনোজ্ঞ ও মননশীল অনুষ্ঠান বি-বি-সি-ই বেশি পরিবেশন করে থাকে। সুবিধা এই যে, প্রচারমাধ্যম ও শিল্পমাধ্যম হিসাবে বি-বি-সি যথেষ্ট আত্মসচেতন ও বিশ্লেষণপ্রিয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে-বিদেশে টেলিভিশনের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে সর্বদা আগ্রহী এবং বিভিন্ন দেশের টেলিভিশন ব্যবস্থার উপরে তথ্যচিত্র প্রস্তুত করতে ব্যগ্র। এই তথ্যচিত্রগুলির অনেক জায়গা জুড়ে থাকে অন্য দেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠানের অংশ। এভাবে ক্যানাডা, কিউবা, ব্রাজিল, ইস্রায়েল, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশদেশ, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, এমন কি ভারতের টেলিভিশন অনুষ্ঠান থেকেও নানান অংশ দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে।

বি-বি-সি-র একটি অনুষ্ঠান থেকেই জেনেছি যে বিভক্ত বার্লিনে টেলিভিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ। পূর্ব-পশ্চিম দুই বার্লিন পরস্পরের টেলিভিশন মারফৎ পরস্পরের খবরাখবরের ও চিন্তাধারার হদিশ রাখতে পারে। বিশেষত পূর্ব বার্লিনের মানুষের কাছে এর মূল্য প্রভূত, কারণ পশ্চিম সম্পর্কে খাঁটি খবর পাবার আর কোনো পথ তার নেই। পুবের খবর বা বইপত্তর পশ্চিমে ঢুকতে পারে, কিন্তু পশ্চিমের সংবাদপত্র-পুস্তকাদি পুবে ঢুকতে পারে না। বেতার বা টেলিভিশনকে বইপত্রের মতো নিষেধের কাঁটাতার দিয়ে আটকে রাখা যায় না। 'মুক্ত দুনিয়া', বিশেষত তাদেরই প্রতিবেশী পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে পূর্ব বার্লিনের

নাগরিকদের কৌতূহল স্বাভাবিক বৈ নয় ; ফলে তারা যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে পশ্চিম বার্লিন কর্তৃক প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে এবং তার সাহায্যে 'মুক্ত দুনিয়া' সম্পর্কে নিজেদের ওয়াকিবহাল রাখে।

এও জেনেছি যে, ক্যানাডার ফরাসীভাষী কুইবেক অঞ্চলে ফরাসীভাষাশ্রয়ী টেলিভিশন ফরাসীভাষী ক্যানাডীয়দের জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি-অভিমান ও রাজনৈতিক আত্মসচেতনতাকে বহুগুণ বর্ধিত করেছে এবং ইংরেজীভাষী ক্যানাডীয়দের থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধকে তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য তাদের দাবিকেও পুষ্ট করেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মাধ্যমে রিলে করা সম্ভব হওয়ায় একই টেলিভিশন অনুষ্ঠান মহাদেশ জুড়ে প্রচারিত হতে পারে। ভারতেও বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইয়োরাপেও বিশেষ কোনো ঘটনা উপলক্ষ্যে এটা করা হয়। যেমন সম্প্রতি পশ্চিমে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে পুবে ইস্রায়েল ও তুরস্ক পর্যন্ত দর্শকেরা 'ইয়োরো-ভিশন'-এর মাধ্যমে একই গীত প্রতিযোগিতা দেখতে পারলো। একই উপায়ে ফরাসী টেলিভিশনের সান্ধ্যসংবাদ পরিবেশন কয়েক ঘণ্টা ধরে ব্রিটেনে নৈশ 'তেলেজর্নাল' (Téléjournal) আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বত্রই এক অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হবে। এই নৈকট্যের ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

২

যন্ত্র হিসাবে টেলিভিশন কতগুলি প্রচণ্ড সুবিধার অধিকারী। আকারে সেটি একটি সুইচ-সম্বলিত ছোট সাইজের বাক্স—কথ্য ইংরেজীতে ঠাট্টাচ্ছলে তাকে 'দ্য বক্স' বলে ডাকাও হয়ে থাকে—এবং বেতারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধারণ নাগরিকদের ঘরে ঘরে একবার তার প্রবেশ ঘটলে তার জয় প্রায় অবশ্যম্ভাবী। বেতার যেখানে শুধুমাত্র ধ্বনিনির্ভর, টেলিভিশন সেখানে চোখ এবং কান দুই ইন্দ্রিয়কেই তৃপ্ত করতে সমর্থ। গতিশীল দৃশ্যাবলী এবং ধ্বনির চিত্তাকর্ষক সমন্বয়ে, সংবাদ পরিবেশনের সময় ঘটনাস্থলের সঙ্গে চোখকানের সরাসরি সংযোগস্থাপনে তার ঈর্ষণীয় ক্ষমতা, প্রমোদবিতরণে তার যান্ত্রিক ক্লান্তিহীনতার কৌশলে টেলিভিশন যথার্থই বলতে পারে, 'আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'। প্রথমে দর্শকদের চোখ কানকে, তারপর সামগ্রিক অর্থে তাদের বোধশক্তিকে টেলিভিশন অল্প আয়াসে বশে এনে ফেলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় যে কোনো শহরে কোনো

নতুন ছবি মুক্তিলাভ করার পর সিনেমা হলের সামনে মানুষের ভিড় স্মরণীয়। সাধারণ মানুষ, সে বিত্তশালী দেশের নাগরিকই হোক, আর ছা-পোষা বাঙালীই হোক, কোনো কঠোর আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত না হলে খোঁজে একটু প্রমোদের স্বাদ। সেই প্রমোদের অষ্টপ্রহরব্যাপী উপকরণকে যদি একটি বাক্সের আকারে একেবারে বাড়ির ভিতরেই পাওয়া যায়, সিনেমাহলে দৌড়নোরও প্রয়োজন থাকে না, তাহলে সেটি যে গৃহদেবতার সমান হয়ে উঠবে তা আর বিচিত্র কি? ঠাকুরঘরে ঠাকুরের যে স্থান, পাশ্চাত্ত্য দেশের ঘরে ঘরে টেলিভিশনেরও প্রায় সে স্থান হয়েছে—সে হয়ে উঠেছে বৈঠকী কামরার 'ফোকাল পয়েণ্ট'।

প্রাচ্য অর্থে যৌথ পরিবারপ্রথা পশ্চিম ইয়োরোপে বহুদিন ধরেই বিলুপ্ত, তবে শিল্পবিপ্লবের আগেকার সমাজে বিবাহিত যুবকযুবতীরা বাপমায়ের সঙ্গে এক আস্তানাতে না থাকলেও সাধারণত এক গাঁয়ে বা কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে বাস করতো। ফলে দু-তিন পুরুষের মধ্যে লেনদেনটা বেশি হতে পারতো। বুড়ো-বুড়ীরা নাতিনাতনীদের সঙ্গ বা শেষ জীবনে সেবাটুকু বেশি পেতেন, যুবতী মায়েরা সন্তানপালনে মা বা শাশুড়ীর খানিকটা সাহায্য পেতে পারতেন। সে সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর তো ছিলোই, পাড়াতুতো সম্পর্কগুলোও প্রবল ছিলো, —প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনতো, বিপদে-আপদে সাহায্য করতো। এক কথায়, মানুষ আরও বেশি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিলো। শিল্পবিপ্লবোত্তর সভ্যতায় আত্মীয়তার বন্ধন শিথিলতর। বাবা, মা, নাবালক সন্তানদের যে-সমষ্টিকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি' বলে অভিহিত করেন এখন হলো সেই কোষতুল্য ক্ষুদ্র পরিবারেই যুগ। অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ছেড়েই দিলাম, কৈশোরের গণ্ডী পেরোনোর পর বাপ-মা ও আপন ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কই শ্লথ হয়ে পড়ে। আর পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো আধুনিক শহুরে জীবনে কতখানি ম্লান হয়ে যায় তা কলকাতার লোকেদেরও অজানা নেই। অথচ প্রকৃতি প্রকৃত ফাঁক পছন্দ করে না, বোধহয় তাই গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন গৃহরূপ বাক্সে বন্দী মানুষের ত্রাণকর্তা হয়ে পড়েছে টেলিভিশন-নামক বাক্সটি। টেলিভিশন নিয়ে নিয়েছে একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক ভূমিকা : বিচ্ছিন্ন মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে অহর্নিশ সংগ্রামের অস্ত্র সে।

পশ্চিমের সব দেশই ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, উত্তর আমেরিকা ইত্যাদির মতো যন্ত্রশিল্পনির্ভর ও নগরপ্রধান নয়, তবে সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গতি সে দিকেই। সর্বত্রই বৃহত্তর পারিবারিক এবং পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো

শিথিল হয়ে পড়ছে এবং কোষ-পরিবারের সত্তা দৃঢ় হচ্ছে। সেই সুযোগে টেলিভিশনের প্রভাবও বেড়ে চলেছে এবং তার ফলাফলও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। ইউরোপের একটি অপেক্ষাকৃত 'অনগ্রসর' দেশ স্পেনের জিপ্‌সী পরিবারগুলি বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে 'ফ্ল্যামেংকো' রীতির নৃত্যগীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে ও বিবর্তিত করেছে। এই শিল্পশৈলী মূলত গোষ্ঠীর জীবনজাত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্পেনের জিপ্‌সীরাও নগরসভ্যতা এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পাল্লায় পড়ে তাদের আস্তানা ছেড়ে সরকারি ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানে তারা অন্যান্য শহরবাসীদের মতো কোষ-পারিবারিক টেলিভিশন-কেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, ভুলে যাচ্ছে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত নৃত্যগীতের ধারা। টেলিভিশনই যেখানে প্রমোদ জোটাতে ব্যস্ত, সেখানে নিজেদের উঠোনে নেমে নাচার বা গলা ছেড়ে গাওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়? ফ্ল্যামেংকো শিল্পীদের মনে তাই আশঙ্কা যে অন্যান্য অনেক লোকশিল্পের মতো ফ্ল্যামেংকোও তার গোষ্ঠী-পরিবেশ হারিয়ে হয়ে পড়বে শুধু শিল্পীদেরই শিল্প। স্টুডিওতে, স্টেজে, হয়তো টেলিভিশনের পর্দাতেই তাকে 'ধরে রাখতে হবে'। মজা এই যে ফ্ল্যামেংকো সম্পর্কে এ খবরটিও আমি পেয়েছি টেলিভিশনের মাধ্যমেই: বি-বি-সি-র একটি ফ্ল্যামেংকো-সমীক্ষায়।

সন্দেহ নেই যে, প্রতিকূল জলবায়ুর সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত টেলিভিশন সেবনের কিছু যোগাযোগ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবন যেমন ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে রাস্তায় উপচে পড়ে, বিকেল-সন্ধ্যায় রোয়াকে এবং দাওয়ায় আড্ডা জমে উঠে, শীতপ্রধান দেশের মানুষ তেমনি ভালোবাসে দিনের কাজ শেষ করে খাওয়াদাওয়া সেরে জানলার পর্দা টেনে আগুন পোহাতে, আর সেই অলস মুহূর্তে টেলিভিশন যে সাধারণ মানুষের সন্ধ্যাসঙ্গী হয়ে উঠবে তা প্রত্যাশিতই বটে। যারা রান্নাবান্নার ঝামেলার মধ্যে যেতে নারাজ তারা রেডি-মেড খানা চটপট গরম করে নিয়ে কোলের উপর ট্রে-তে সাজিয়ে বসে পড়ে; খাওয়া আর টেলিভিশন দেখা একসঙ্গেই চলতে থাকে। বাইরে যখন বরফ ঝরছে বা উত্তুরে হাওয়া বইছে তখন গৃহাভ্যন্তরের নিশ্চিন্ত উষ্ণতায় সুইচ টিপে প্রাপ্তব্য প্রমোদই যে মানুষের প্রিয়তর হবে এ তো স্বাভাবিকই। এও নিজের পর্যবেক্ষণ থেকেই জানি যে, এ দেশের মানুষ গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালেই বেশি ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে। টেলিভিশনে পরম আসক্ত বালকেরাও জুন-জুলাইয়ের রোদে ভরা লম্বা দিনগুলি এলে ফুটপাথে সাইকেল চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে রোদের দেশের মানুষ

শীতের দেশের মানুষের চাইতে দৈনিক কত ঘণ্টা কম টেলিভিশন দেখে, জলবায়ু অনুসারে এই নেশাটা ঠিক কী হারে বাড়ে বা কমে সে-জাতীয় কোনো পরিসংখ্যান আমার জানা নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাজিলের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও টেলিভিশন প্রতাপশালী। ব্রাজিলের টেলিভিশনে সরকারী প্রচার প্রচুর পরিমাণে হয়ে তো থাকেই, উপরন্তু একটি চ্যানেল শ্রমিকশ্রেণীর ছেদহীন চিত্তবিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট। সে চ্যানেলটিতে ভোর থেকে গভীর রাত অবধি নাচ গান, ভাবাবেগে আপ্লুত নাটক, বীররসে ভরপুর আখ্যান ইত্যাদি পরিবেশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ চ্যানেলটির ভূমিকা বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়। অপর পক্ষে কিউবাও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং তার টেলিভিশনও সরকারি প্রচারে নিযুক্ত, তবে দুই দেশের প্রচারে বিস্তর প্রভেদ। কিউবার টেলিভিশন কঠোর আদর্শবাদী বিপ্লবকে সার্থক করার কাজে উৎসর্গীকৃত, এবং শুধু প্রমোদবিতরণ তার উদ্দেশ্য নয়।

৩

এবারে আসা যাক পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে টেলিভিশনের কী প্রভাব তার পর্যালোচনায়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এই পরিবেশে মা ও শিশুর নিঃসঙ্গতার কথা। তৃতীয় দুনিয়ার বস্তিবাসিনী মায়ের শিশু হয়তো অপুষ্টিতে ভুগছে, তার নেই দুধ বা রোগের পথ্য, কিন্তু তাদের চারদিকে আছে মানুষের উত্তাপ ও কলরোল। অপর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারের মা ও শিশু ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবৃত হয়েও মানবিক সঙ্গ থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন, যেন দ্বীপবর্তী। এই নিভৃত পরিবেশে শিশুদের মুখে কথা সাধারণত একটু দেরিতেই ফোটে। একাধিক লোক শিশুদের সঙ্গে অনর্গল কথা বললে শিশুরা তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে। পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারের প্রাক্-বিদ্যালয়ে শিশু সারাটা দিন কাটায় শুধু মায়ের সান্নিধ্যেই। তার অন্য কোনো পরিচারিকা তো নেইই, রোজগারী বাবার সঙ্গেও তার আদানপ্রদানের প্রধান সময় হপ্তাশেষটুকু। বিশেষত স্মরণীয় যে, শীতপ্রধান দেশের শিশুরা সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায়; ফলে তাদের বাবারা যখন কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরে তখন তারা হয় শুয়ে পড়েছে নয় শুতে যাবে।

শিশুর জন্মের পর বর্ধিত গৃহকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের দেহমনের সবকিছু খোরাক জোগানোর ভার এসে পড়ে একা যুবতী মায়ের ঘাড়ে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ

অবস্থায়, পরিচারক-পরিচারিকার সহায়তা ছাড়া, গৃহকর্ম এবং শিশুদের তত্ত্বাবধান যে কতখানি শ্রমসাধ্য এবং কী পরিমাণ মানসিক উত্তেজনা ও ক্লেশ সৃষ্টি করতে পারে তা যিনি এ কাজ করেননি তাঁর ধারণার বাইরে। উপরন্তু মনে রাখতে হবে যে, জীবনযাত্রার উন্নত মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘরকন্না এবং সন্তানপালনের মানও পশ্চিমে রীতিমত উঁচু। নারীর কর্মকুশলতা এবং গুণবৈচিত্র্যের ব্যাপারে এ সমাজের প্রত্যাশা প্রায় অসীম, এবং এখানে সুগৃহিণী আখ্যা পাওয়া কোনো মুখের কথা নয়। 'ভালো বৌ', 'চমৎকার মেয়ে', 'দারুণ গিন্নী', এবংবিধ নাম কিনতে হলে প্রায় চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হওয়া দরকার। শুধু বসবার ঘরটিকেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে চলবে না, রান্নাঘরটিকেও ফিটফাট ধোপদুরস্ত পরিচ্ছন্নতায়, এমন কি বসবার ঘরের মতোই শৌখিন শোভন শ্রীতে মণ্ডিত অবস্থায় রাখতে হবে। বাড়ির সামনে বা পিছনে ফাঁকা জায়গা থাকলে তাকে মালীর সাহায্য ছাড়াই ফুল আর সব্‌জিতে ভরিয়ে তুলতে না পারলে প্রশংসা পাওয়া যাবে না। তা ছাড়াও বাড়ির ভিতরে জানালার তাকে যেখানেই রোদ পড়ে সেখানেই সারি সারি টবে ফুল বা পাতাবাহারের কেয়ারি করতে পারা চাই। পশম বোনা, শৌখিন সেলাই ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিলাম, সে সব ছেলেখেলা মাত্র : গাড়ি চালানো, দরজা-জানালা-দেয়াল রঙ করা, ওয়ালপেপার লাগানো, এসব কাজে অভিজ্ঞতাও নিতান্তই প্রত্যাশিত। কাঠের কাজ এবং ইলেকট্রিক মেরামতের কাজ জানা থাকলে আরোই ভালো। রোজকার আহার জোগানো ছাড়াও হরেক রকমের মিষ্টি রান্না, কেক-পেস্ট্রি-বিস্কুটের বেকিং, পার্টির উপযুক্ত রন্ধনপ্রণালী ও পরিবেশনের কায়দাকানুন রপ্ত থাকা চাই ; এবং বাজার করা থেকে শুরু করে পরিবেশন করা পর্যন্ত প্রতিটি অনুপুঙ্খই নিজের হাতে করতে হবে, বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহিণীর মতো পরিচারক-পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে নয়। এ সমাজের পুরুষেরা যদিও বাধ্য হয়েই গৃহকর্মে হাত লাগায়, তবুও মোটের উপর তারা যেহেতু দিনের অধিকাংশ সময় রোজগারে ব্যস্ত এবং ঘরের বাইরে, তাই সংসারের হাজার কাজের প্রধান দায়িত্ব অনিবার্যত স্ত্রীদের ঘাড়েই এসে পড়ে।

ফলে এ সমাজে কচি শিশুদের মায়েরা যে প্রায়ই ক্লান্তি, নৈরাশ্য, বিষাদ বা স্নায়বিক বৈকল্যের শিকার হয়ে পড়েন তা আর আশ্চর্যের কী। প্রায় নিরুপায় হয়েই মায়েরা তাঁদের শিশুদের বসিয়ে দেন টেলিভিশনের সামনে। শিশুদের কান্নাও থামে ; মায়েরাও হাতের কাজ এগিয়ে নেন। যে পরিবেশে শিশুরা দ্বীপবর্তী, মানবিক ভাববিনিময় থেকে বঞ্চিত, সেখানে টেলিভিশন হয়ে ওঠে তাদের

সঙ্গী, একাধারে ধাই-মা ; বেবী-সিটার ; খেলা-দেনেওয়ালী দিদি ; গল্প-বলিয়ে ঠাকুমা। যারা মানুষের মুখ থেকে মাতৃভাষা শোনার সুযোগ কম পায় তারা টেলিভিশন থেকেই অনেক নতুন শব্দ শিখে নেয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ব্রিটেনের শিশুরা মুখ্যত বি-বি-সি-র 'Playschool', 'Jackanory' ইত্যাদি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান থেকেই শেখে তাদের ঐতিহ্যের ছেলে-ভুলানো ছড়া, গান এবং রূপকথাগুলি। শিশুদের বড় হয়ে ওঠার জীবননাট্যে ঠাকুমা-দিদিমা-মাসী-পিসী-মামা-কাকাদের কথকতার যে-ভূমিকাটি প্রাচ্য যৌথ পরিবারে ধরেই নেওয়া হয় তার অভাবে পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারে টেলিভিশনই হয়ে ওঠে আত্মীয়তুল্য। বাক্সের পর্দাতেই চেনা হয়ে যায় অনুষ্ঠান-পরিবেশকদের মুখ ; এই 'টেলি-তুতো' মামা-কাকা ও মাসী-পিসীরাই আপন আত্মীয়স্বজনের চাইতে বেশি পরিচিত হয়ে যায়।

শিশুরা যত বড় হয়, টেলিভিশন তাদের জীবনে তত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকে। আগেকার দিনের চারণদের মতো আজকের টেলিভিশন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, শিক্ষক তথা প্রমোদ-পরিবেশক। স্কুলের ভূমিকা থেকে তার ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢের বেশী। বি-বি-সি-র ছোটদের জন্য অনুষ্ঠানগুলি যে সত্যিই মনোজ্ঞ তা স্বীকার করার জন্য 'সাহেবদের বুটজুতো-চাটা' হবার কোনো দরকার নেই। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার বিপুল আয়োজনে বি-বি-সি অপরাজেয়। স্কুল-কলেজের ক্লাসঘরে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী তো আছেই, তা ছাড়াও দেশবিদেশের মানুষ, জীবনধারা, ঘটনাবলী, পশুপক্ষী, গাছপালা ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর দিতে, দেশবিদেশের নানান সমস্যা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করতে, বিজ্ঞানকে ঘরোয়া ব্যাপার করে তুলতে, কিশোরদের বিশ্ব-সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে বি-বি-সি-র আত্ম-নিবেদন সত্যিই প্রশংসনীয়। সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতি বিকালে 'John Craven's Newsround'-এ ছোটদের জন্য খবর পড়া হয়, এবং খবর শোনার পর আমার ছেলেরা প্রায়ই গম্ভীর মুখে রান্নাঘরে এসে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে যায়, 'তিমিমাছদের অবস্থা খুবই খারাপ, শিকার করে করে তাদের ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে', কিংবা 'ইণ্ডিয়াতে আরেক দফা সাইক্লোনের উৎপাত হয়ে গেলো'।

এ ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে এমন কতগুলি অনুষ্ঠান আছে যা ছোটরা বড়দের সঙ্গে একসঙ্গে বসে দেখতে পারে। আমি ভাবছি 'Tomorrow's World', 'The World about us', 'Horizon' ইত্যাদি সিরিজের কথা।

আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করবো যে এ জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে আমি নিজে বিপুলা এ পৃথিবী ও বিপুলতর সৌরজগৎ সম্বন্ধে অমূল্য শিক্ষা আহরণ করেছি। নানান অরণ্যের আদিবাসীদের জীবন, নানান সমুদ্রের তিমি-হাঙর, বরফের দেশের বল্গা হরিণ বা পেংগুইন পাখি, ব্রাজিলের কানিভ্যাল, কিউবার আখের ক্ষেত, চীনের 'কমিউন', পিকিং-এর চিড়িয়াখানা, মঙ্গোলিয়ার প্রান্তর, তিব্বতের অভ্যন্তর, মস্কোর বলশয় থিয়েটার থেকে রিলে-করা ব্যালে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাবলী, বালির সুকুমার সৌন্দর্য, শ্যামদেশের বৌদ্ধ মঠ, মালয়ের হিন্দুদের চড়কতুল্য শৈব উৎসব, মার্কিন সৈন্যদের সাইগন-ত্যাগ, উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যদের সাইগনে জয়-প্রবেশ, মায় হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সত্য দৃশ্য, চাঁদে মানুষের পদক্ষেপ, বা মঙ্গল-গ্রহের লাল-পাথর-ছড়ানো শরীর—এত রকমের, এত বিচিত্র দৃশ্য কি টেলিভিশন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বাড়িতে বসে দেখতে পারা যেতো? এ যেন ঘরের ভিতরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বক্তৃতামালার চাইতেই অনুষ্ঠানগুলি সার্থকতর, সুন্দরতর, শব্দ ও দৃশ্যের সময়য়ে বিশেষভাবে লক্ষ্যভেদী। সাম্রাজ্যের অনিবার্য অবক্ষয়ের পর ব্রিটিশ সভ্যতার প্রকৃত মূলধন তার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ, তার চিন্তাজীবনের বৈদগ্ধ্য। সেই মূলধন খাটিয়েই বি-বি-সি টেলিভিশনের রাজা হতে পেরেছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনের 'Open University' বা 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' বি-বি-সি-র মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বক্তৃতামালা পেশ করে।

৪

বস্তুত, ছোটদের এবং বড়দের এই দুই দলেরই মানসিক দিগন্তের সম্প্রসারণে বি-বি-সি-র কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সংগীত, নাটক, অপেরা ইত্যাদির পরিবেশন তো আছেই, তা ছাড়াও সাহিত্য, চিত্রকলা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, চিকিৎসাবিদ্যা, নগর-পরিকল্পনা, স্বদেশের ও বিদেশের সামাজিক সমস্যাবলী ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদি, অপরাধ ও দণ্ডনীতি, শিক্ষা, সন্তানপালন, নারী-আন্দোলন,...এমন বিষয় নেই যার উপরে মননশীল আলোচনাচক্র বা অন্য কোন সুচারু অনুষ্ঠান বি-বি-সি প্রচার করেনি। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উপর একটি সিরিজ হয়ে গেল যার তুলনীয় কোনো আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে পারলে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দর্শন-বিভাগের প্রধানেরা গর্বিত বোধ করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একটি গোপন চুক্তিতে

ব্রিটিশ সরকার কিভাবে স্তালিনের হাতে হাজার হাজার রুশ বন্দীদের সমর্পণ করে—তাদের মৃত্যু অবধারিত তা জেনেও—সে-সম্পর্কে একটি বিস্তারিত তথ্যচিত্র পরিবেশন করে বি-বি-সি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক ব্রিটেনে বর্ণসমস্যা বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ আলোচনাচক্র থেকে এ প্রসঙ্গে এ দেশে যত রকমের মতামত আছে সবই জানতে পারা গেল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ ধরনের চিন্তাশীল কার্যক্রম দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, দর্শকদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'a spectrum of opinion' সেই মতামতের বর্ণালীর প্রদর্শনে দর্শকদের স্বাধীন বিচারশক্তিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস যে, একতরফা যুক্তির, সাফাই গাওয়ার, একপেশে মত প্রচারের সংকীর্ণতার চেয়ে এই তথ্যের সমারোহ ও মতামতের ইন্দ্রধনুই নাগরিকদের বিশ্লেষক বুদ্ধিকে তথা সমালোচনাশক্তিকে বেশি পুষ্ট করতে পারে। এবং এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকদের একটি কথা না বলে পারি না। ইংরেজদের আর যত দোষ থাক, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, তারা অপরকে যতটা সমালোচনা করে তার চাইতে নিজেদের স্থলন-পতন-ত্রুটির সমালোচনা করে ঢের বেশি, এবং অপরকে উপহাস না করে বরং নিজেদের সমাজের হাস্যকর ব্যাপারগুলি নিয়েই হাসাহাসি করে। বি-বি-সি সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাত্রাতিরিক্ত কাতরতা দেখিয়েছিলেন। ভারত বা শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে কোনো অন্যায় মন্তব্য বা অশালীনতা বি-বি-সি-তে কখনো লক্ষ্য করিনি। অথচ রক্ষণশীল দলের নেত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচারকে প্রায়ই সূক্ষ্মভাবে ঠেস দেওয়া হয়ে থাকে, এবং তার আগে টেড্ হাথ্‌কে দেওয়া হতো। জনপ্রিয় কমিক সিরিজ 'The Goodies'-এর অভিনেতাদের নীতিবাক্য হলো: 'আমরা যেখানে যা খুশি তাই করি,' এবং এদের ভাঁড়ামির পিছনে প্রায়ই থাকে যথার্থ স্যাটায়ার, শ্লেষাত্মক সামাজিক-রাজনৈতিক সমালোচনা। এই সিরিজটিতে রানী এলিজাবেথ বা হ্যারল্ড্ উইলসনকে নিয়ে যে মস্করা দেখেছি তার তুলনীয় ঠাট্টা-তামাশা অন্য অনেক দেশেই অভিনেতা-প্রযোজক-পরিচালক সবাইকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়তো। স্মরণীয় যে, রঙ্গ-তামাশার মাধ্যমে বা তার ফাঁকে ফাঁকে সীরিয়াস কিছু বলার এই চেষ্টা শেক্সপীয়র থেকে বার্নার্ড শ পর্যন্ত কমিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার।

আগেই বলেছি যে, প্রাচীনকালের চারণদের মতো আধুনিক টেলিভিশন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, শিক্ষক তথা প্রমোদ-পরিবেশক। তবে ঐতিহ্যের সম্প্রসারণে, তাতে নতুন উপাদান বা মাত্রা যোজনার চেষ্টায় টেলিভিশন রেনেসাঁস-

উত্তর যুগেরই প্রতিষ্ঠান। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আরও অনেকে ক্রিয়াকলাপের মতো টেলিভিশন বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ দ্বারা আক্রান্ত—আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা, বিষয়াশ্রয়িত, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষানিরীক্ষা প্রভৃতিতে তার উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। জ্ঞান-চর্চার মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশনের ক্রমোন্নতি অবধারিত। সে প্রসঙ্গে পরে আবার আসছি। আপাতত উল্লেখ করতে চাই যে, নিছক মনোরঞ্জনে টেলিভিশনের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর চলচ্চিত্রশিল্প যেমন হটে যাচ্ছে—আমাদের পাড়ার হলটিও সম্প্রতি উঠে গেল—তেমনি, আমার বিশ্বাস, তার দৌলতে পাশ্চাত্ত্য পুরুষের সঙ্গে হলে পাবে দৌড়নোও খানিকটা কমেছে। পাবের বিকল্প টেলিভিশন। সাধারণ নাগরিক কর্মস্থল থেকে ফিরে দু-চার ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে। হপ্তাশেষে টেলিভিশন দর্শন অনেকখানি বেড়ে যায়। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই ছুটি মার্কা বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। শনিবারে আসর জমজমাট। ঐ দিন বি বি সি-র যুগল চ্যানেলের প্রসাদে বাড়িতে বসে চার-চারটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম দেখা সম্ভব। রবিবারের সকালে এ দেশে অনেকেই যেহেতু বেলায় শয্যাত্যাগ করেন, সেহেতু ঐ সকালটি এশীয় আগন্তুকদের জন্য অনুষ্ঠান, ফরাসী বা জার্মান ভাষা শিক্ষার আসর, এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য চিহ্নিত। খ্রীষ্টান দেশের মানুষের অবশ্য রবিবারে ধর্মচিন্তা করার কথা। ধর্মবিশ্বাসের স্রোত মন্দগতি হয়ে এসেছে, গির্জাগুলিতে ভিড় হতে চায় না। যারা বাড়িতে বসেই উপাসনার পরিবেশটুকু পেতে চান তাঁদের জন্য কিছু রবিবাসরীয় পূজা-আর্চা, ভজন গান ইত্যাদি কোনো গির্জা বা ক্যাথিড্রাল থেকে রিলে করার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য প্রসঙ্গত এ-ও উল্লেখযোগ্য যে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে প্রশ্ন করে আলোচনার সূত্রপাত করতেও বি-বি-সি পশ্চাৎপদ নয়, এবং সম্প্রতি বি-বি-সি-র 'Who was Jesus ?' অনুষ্ঠানটি থেকেই প্রথম খবর পেলাম যে খ্রীষ্টধর্মের কোনো কোনো মুখপাত্রই বলতে শুরু করেছেন যে, যীশু একজন ইহুদী ধর্মগুরু ছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের অবতার ছিলেন না। রোববারের দুপুর থেকে বি-বি-সি-র কার্যক্রম হালকা এবং গুরুগম্ভীর কর্মসূচীর ঠাসবুনটের একটি পরা-কাষ্ঠা। তিনটি গোটা ফিল্মের ব্যবস্থা। ফলে সপ্তাহান্তে বাড়িতে বসে দুদিনে সাতটি ছবি দেখা সম্ভব, যে-কারণে সিনেমাহলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হুল্লোড়ের ফাঁকে ফাঁকে তুষায় যুগ কাকে বলে, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ কেন হয়, হাইড্রোগারের অস্তিত্ববাদের স্বরূপ কী, এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানও ঢোকানো থাকবে।

কোষ-পরিবারপ্রথার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিণাম প্রৌঢ় বয়স থেকেই নর-

নারীদের জীবনে নতুন করে নিঃসঙ্গতার উদয়। প্রাক্-বিদ্যালয় পর্যায়ের শিশুকে মানুষ করার সময় যুবতী মা যে ক্লেশ ও নিঃসঙ্গতা সহ্য করেন তার খানিকটা লাঘব হয় ছেলেমেয়েদের স্কুলজীবনের সময়ে। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গীর কোঠায় চলে আসে, বন্ধুবান্ধব ঘরে আনে, হয়তো তাদের মায়েদের সঙ্গেও আলাপ জমে যায়। জন্মদিনের পার্টি এবং ক্রিসমাস উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়িতে আনন্দের সাড়া জাগে। কিন্তু দুটি দশক যেতে না যেতেই থেমে যায় এ কোলাহল। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে চলে যায় যে যার কর্মস্থলে, বা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটেনে ছেলে-মেয়েদের ষোল বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ; তারপর তাদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সত্তা স্বীকৃতি পায়, এবং বেকার থাকলে তারা বেকারভাতার দাবিদার হতে পারে। ফলে এই বয়স থেকে তারা বাপ-মায়েদের থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ দেশের ছেলেমেয়েরা এমনই স্বাধীনতার ভক্ত যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে এক শহরে থাকলেও প্রায়ই চাকরি পেলেই—বিয়ের আগেই—তারা আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে যেতে চায়। তারপর তাদের নিজস্ব সংসার পাতবার, নতুন পারিবারিক ইউনিট স্থাপন করবার সময় তো এসেই পড়ে। প্রৌঢ় বয়স থেকে আবার একলা হয়ে যান অধিকাংশ বাপ-মায়েরা। এবং স্বামী-স্ত্রীর এক মুহূর্তে মৃত্যু যেহেতু দুর্লভ, সেহেতু কোষ-পরিবারের সভ্যসংখ্যা বিলুপ্তির আগে দুই থেকে একে ঠেকে। বিধবা, বিপত্নীক, বা অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা টেলিভিশনের বড় রকমের গ্রাহক। দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যাগুলিতে টেলিভিশন তাঁদের সময় কাটাতে অমূল্য সাহায্য করে, নির্জন ঘরে এনে দেয় মানুষের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর, হাস্যরোল, সান্নিধ্য। যাঁরা বিশেষভাবে জরাগ্রস্ত, বা বাতের রোগী, বা পক্ষাহত, তাঁদের পক্ষে টেলিভিশন দেবতার বরের সমান। কেউ কেউ বসবার ঘরে একটি, শোবার ঘরে একটি, দুটি সেটের ব্যবস্থা করেন। কোনো নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়াকে আমি বলতে শুনেছি : 'টেলিভিশনের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। যখন একলা লাগে, তখন নিজেকে বোঝাই, ঐ তো ওরা হাসছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে, রসিকতা করছে। রিচার্ড বেকার, অ্যাঞ্জেলা রিপন* এঁরা আমার দিকে,আমার মতো কত একলা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে খবর পড়ছেন।' এইভাবে টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানপরিবেশকেরা বা অভিনেতারা টেলি-তারকায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। বি-বি-সি-র পুলিশ-সংক্রান্ত সিরিজ 'Dixon of Dock Green' বা আই-টি-ভি-র শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সিরিজ

* এঁরা বি-বি-সি টেলিভিশনে খবর পড়েন।

'Coronation Street' জনমানসে প্রায় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। শুনেছি যে, দর্শকদের অনেকের নাকি খেয়াল থাকে না যে, চরিত্রগুলি ও ঘটনাগুলি কল্পিত, এবং গল্পের মধ্যে একজন মারা যাওয়ার পর যিনি অভিনয় করছিলেন তিনিই মারা গেছেন এই ভেবে কোনো দর্শক নাকি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সমবেদনা জানিয়ে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন, যেমন পশ্চিমে রীতি। এই ধরনের অনুষ্ঠানে পাই টেলিভিশনের একটি ঘরোয়া ঘরানা, যার ভূমিকা পারিবারিক প্রমোদবিতরণ ও সমাজের সাধারণস্বীকৃত মূল্যবোধগুলির সংরক্ষণ। আবার অন্য আরেক ধরনের অনুষ্ঠানে প্রচলিত ভাবনা বা মূল্যবোধকে প্রশ্ন বা সমালোচনা করা হয়। ফলে স্থিতি ও পরিবর্তন, সমাজ-ব্যবস্থার এই দুই প্রবণতাই টেলিভিশনে প্রতিফলিত হয়, যেমন হয় সাহিত্যে।

৫

এবারে আসতে হয় টেলিভিশনের কতগুলি নঙর্থক দিকের আলোচনায়। প্রথমত, টেলিভিশনের উপস্থিতি দৈনন্দিন জীবনে কতগুলি অপ্রিয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। টেলিভিশনের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ছেলেবুড়ো সবাইকারই সামাজিকতায় ভাঁটা পড়ে। শুধু যে আহারনিদ্রা শিকেয় ওঠে তাই নয়, গৃহে অতিথি এলে অতিথি সৎকারে ত্রুটি হয়, অতিথির সঙ্গে কথা না বলে গৃহস্বামী ও গৃহিণী সম্মোহক টেলিভিশনের দিকেই তাকিয়ে থাকেন ; ছোটরাও উঠে দাঁড়াতে, স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে ভুলে যায়। পাছে তাদের কোনো প্রিয় অনুষ্ঠান দেখা বাদ পড়ে যায় সেই ভয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াতে যেতে পর্যন্ত চায় না, কিংবা কোথাও গেলে ফিরে আসার জন্য ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকে এবং ভবিষ্যতের আনন্দকে হারানোর আশঙ্কায় বর্তমানের আনন্দটুকুকে পুরোপুরি উপভোগও করতে পারে না। টেলিভিশনের সম্মোহনশক্তিকে বোধহয় খানিকটা এড়াতে পারে প্রথম যৌবন, হয়তো নিছক জৈব তাগিদেই। কিন্তু প্রেমে পড়ার বা সাথী খোঁজার পর্যায়টা পেরিয়ে গেলে আবার যে-কে-সেই। তখন বিবাহিত দম্পতিরা বিশ্রম্ভালাপের বদলে টেলিভিশনদর্শনে ব্যস্ত থাকেন। ফলে এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, টেলিভিশনের শারীরিক উপস্থিতি এমন একটা প্রলোভন, যাকে এড়ানো কঠিন। এই গৃহস্থিত চলচ্চিত্রের উৎসটিকে সর্বদা খুলে রাখার লোভ অনেকেই সংবরণ করতে পারেন না। ঠিক যেমন গরমের দিনে বিজলী পাখাকে কেউ বন্ধ করতে চান না, ঠিক তেমনই অনর্গল বক্‌-বক্‌ করতে থাকা টেলিভিশনকে বোতাম টিপে বন্ধ করে দেবার জন্য কেউ উঠতে

চান না, তার জন্য যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। এই যন্ত্রটির বিরামহীন বাচালতা ও পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী মানবিক ভাববিনিময়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

সব থেকে বেশি বিপদ ছোটদের। একেবারে ছেড়ে দিলে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন দেখেই কাটিয়ে দিতে পারে। আগেকার দিনে আমরা জানতাম যে মেধাবী ছেলেমেয়েরা 'বইয়ের পোকা' হয়। বইয়ের পোকা হতে হলে খানিকটা মাথা খাটাতে হয়। টেলিভিশনের পোকা হওয়া তার চাইতে অনেক সহজ ; মাথা ঘামানোর কোনো দরকারই নেই, সোফায় গা এলিয়ে চোখ খুলে বসে থাকলেই হলো। কাজেই পাশ্চাত্ত্য সমাজের ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে টেলিভিশনের পোকা বিস্তর। বাধা দিতে গেলে সরব প্রতিবাদ অবধার্য। কোনো এক শনিবার আমার ছেলেদের আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম, বাধা না দিলে তারা কত ঘণ্টা টেলিভিশন দেখতে পারে তা দেখার উদ্দেশ্যে। সেদিন আমার বড় ছেলে সাড়ে ন' ঘণ্টা টেলিভিশন দেখেছিল, ছোটজন তার চাইতে খানিকটা কম।

মুশকিল এই যে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে টেলিভিশন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং হাজার হাজার লোকের জীবিকা তার সঙ্গে বাঁধা। এতজন কর্মীকে কাজ জোটাতে গিয়ে তার অনুষ্ঠানসূচীও হয়ে পড়েছে বড্ড বেশি দীর্ঘকাল-স্থায়ী, ফলে ভালো-মন্দ-মাঝারিতে মেশানো। কোষ-পরিবারের নিঃসঙ্গতাকে সে যেমন দূর করে, আবার তেমনই ঘরের মধ্যে একবার খুঁটি গেড়ে বসলে অনাহূত আগন্তুকের মতো বসেই থাকে, উঠতে চায় না। হয়তো দুটি ভালো অনুষ্ঠানের মাঝখানে আধঘণ্টাখানেক এমন একটি অনুষ্ঠান যা দেখা সময়ের অপচয়মাত্র। ছোটরা সাধারণত ঐ আধ ঘণ্টা উঠে অন্য কিছু করতে চাইবে না, ঠায় বসে থাকবে। তা ছাড়া কোনো 'সীরিয়াস হবি'-র পক্ষে টেলি-রুটিন থেকে মেরে-কেটে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় করে নেওয়া পর্যাপ্তও নয়। আবার হয়তো যেসব অনুষ্ঠান দেখলে তারা সত্যিই লাভবান হতে পারতো সেগুলিকে দেখানো হচ্ছে অনেক রাতে, যখন তাদের ঘুমোতে যাবার সময়। এটা তো প্রায়ই হয়। শনিবারের সকাল ধরে বা সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে সন্ধ্যা ছটা-সাতটার 'peak viewing time'-এ হয়তো চললো নিছক ভাঁড়ামি বা কোনো আদ্যিকালের 'Cowboys and Indians' ফিল্ম, অথচ কোনো ভালো অপেরা, ব্যালে, নাটক, ফিল্ম বা আলোচনাচক্রের সময় নির্দিষ্ট হলো রাত সাড়ে নটায় বা সাড়ে দশটায়। তাদের সুরুচির পরিশীলনের পক্ষে এমন ঘটনা সুযোগের শোচনীয় অপচয়।

টেলিভিশন দেখাটা এক রকমের 'passive entertainment' যা দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে না। ফুটবল না খেলে, বাজনা না বাজিয়ে অভিনয়ে না নেমে হাত-পা গুটিয়ে বসে খেলাধুলা, বাজনা বা অভিনয় টেলিভিশনের পর্দাতেই দেখা যায়। এই নিষ্ক্রিয়তা দু-ভাবে ক্ষতিকর। প্রথমত, এর ফলে ছোটরা অলস হয়ে পড়ে। তাদের মূল্যবান অবসর সময়ে, যখন তারা অন্য কোনো নেশা নিয়ে মাততে পারতো, তখন তারা আজে-বাজে অনুষ্ঠান দেখে সময় নষ্ট করে। খেলাধুলা, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, বই-পড়া, হোম-ওয়ার্ক ইত্যাদি রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, বিশেষত সেই ক্রিয়াকলাপই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেগুলি সময়-সাপেক্ষ ও অনুশীলনসাপেক্ষ, যেগুলির জন্য চাই উদ্যম ও নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ। নিছক সময়ের অপচয়ের ফলে তো বটেই, তা ছাড়াও সৃষ্টিশীল বৃত্তিগুলিতে জড়তা আসার ফলে টেলি-লালিত শিশুদের পক্ষে শিল্পী, কবি, সংগীতজ্ঞ বা গণিতজ্ঞ হয়ে ওঠা কঠিন হতে পারে—অন্তত আমার সেই ভয় হয়। যেসব মায়েরা চান যে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের কিছু 'সীরিয়াস হবি' থাকুক তাঁদের রীতিমত সংগ্রাম করতে হয় সন্তানদের সঙ্গে। এদিকে কোষ-পরিবারে বাপ-মায়ের কর্তৃত্ব প্রাচীনপন্থী নয় বলে এই সংগ্রামের টেনশনও তীব্র এবং মায়েদের পক্ষে বিশেষ ক্লান্তিকর। যেখানে ঠাকুর্দা-জ্যাঠাদের শাসন নেই, মাসী-পিসীদের সর্দারি নেই, বড়দের চোখ-রাঙানি অনেক কম, সেখানে ছোটদের স্বাতন্ত্র্য অনেক বেশি। অন্যান্য মাতব্বরদের অনুপস্থিতিতে শিশুরা তাদের বাপ-মায়ের বেশি কাছাকাছি, সমান-সমান, বন্ধুতুল্য। এই সাম্য নানা দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় হলেও কতগুলি ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এবং আলোচ্য প্রসঙ্গ সেগুলির অন্যতম। 'এখন টেলিভিশন দেখা চলবে না' বললেই কোষ-পরিবারের ছেলেরা তা মেনে নেবে না, তাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ বিতর্কে নামতে হবে, এবং তার জন্য যে সময় ও ধৈর্যের দরকার তা কতজন মায়ের থাকতে পারে? আর বাপেরা তো হামেশাই দৃশ্যে অনুপস্থিত, স্রেফ নেপথ্যচারী। ফলে টেলিভিশন দেখা উপলক্ষ করে মা ও ছেলেদের মধ্যে নিত্য-নৈমিত্তিক দ্বন্দ্বও পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

নিষ্ক্রিয় গ্রহণশীলতার মেজাজে শিশুরা যখন টেলিভিশনের সামনে গা এলিয়ে বসে থাকে তখন পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন তাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বি-বি-সি অবশ্য বিজ্ঞাপন বহন করে না, কিন্তু আই-টি-ভি-র অনুষ্ঠানগুলি সেই 'রেডিও সিলোন কি ব্যাপারী ভাগ', যা এখনও চালু আছে কি না আমার জানা নেই, তারই মতো ব্যাপার—কর্মসূচীর ফাঁকে ফাঁকেই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। এই

মানসিক ভেষজ নিয়মিত সেবন করার পর ছোটরা খবরের কাগজ পড়তে শেখার ঢের আগেই চকোলেট-লজেন্স-আইসক্রীম-সাবান ইত্যাদি ব্যাপারে এমন বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়ে যে, হাতব্যাগে-সীমিত-টাকাকড়ি-ধারিণী বেচারী মায়ের পক্ষে তাদের নিয়ে হাটবাজার করাই দায় হয়, অথচ বাচ্চাদের আয়ার জিম্মায় রেখে বাজারে বেরোনোও পশ্চিমে সম্ভব নয়!

ভোগসামগ্রীর ব্র্যাণ্ড-নাম সম্পর্কে শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা অপ্রীতিকর, অসুবিধাজনক, হয়তো অবাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু তাদের রুচি মনে ফিল্মী যৌনতা ও হিংসাদৃশ্যের প্রভাব নিশ্চয় আরও অনেক গুরুতর বিষয়। এ ব্যাপারে প্রধান অপরাধী বৃহত্তর চলচ্চিত্রজগৎ থেকে প্রদর্শিত ছবিগুলি—সংক্ষেপে বলা যায় যে, যে-জগৎটা আগে সিনেমাহলে আবদ্ধ ছিলো তা এখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে—কিন্তু টেলিভিশনের স্বনির্মিত নিজস্ব কর্মসূচীও এ গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। এবং যতদূর শুনেছি, ব্রিটিশ টেলিভিশনে যতটা যৌনতা, মারামারি, বা খুনোখুনি দেখা যায় মার্কিন টেলিভিশনে দেখা যায় তার চাইতে ঢের বেশি। ছোটদের মনে 'টি-ভি সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স'-এর প্রভাব ক্ষতিকর কিনা সে-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে তর্ক আছে, কিন্তু তর্কের মীমাংসা নেই, এবং তর্ক চলাকালীন ছোটরা সমানে টেলিভিশন দেখে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সাধারণভাবে অভিভাবকদের উদ্বেগ অবশ্যই আছে, এবং নাগরিকদের মধ্যে টি-ভি যৌনতা ও হিংসাদৃশ্যের বিরোধী 'লবি'-ও আছে। লক্ষণীয় যে, যাঁরা মনে করেন যে, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই তাঁরা অল্পশিক্ষিত নন, উচ্চশিক্ষিতই বটে। মনোবিজ্ঞানীরা এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বিরোধী রায় না দেওয়া পর্যন্ত এঁরা মত বদলাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এঁরা প্রতিভাত হন পশ্চিমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্যের দাসরূপে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর এঁরা এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যে, সামাজিক মানুষকে কিভাবে সাধারণ জ্ঞান খাটাতে হয় তা ভুলে মেরে দিয়েছেন। আমি স্কুলের শিক্ষিকা, ধর্মযাজকের স্ত্রী, এ হেন শিক্ষিতা মায়েদের বলতে শুনেছি যে, টি-ভি-তে প্রদর্শিত খুনখারাপি বা অশ্লীলতার কোনো কুপ্রভাব নেই। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, পৃথিবীতে 'সুপ্রভাব' বলে যদি কিছু থাকে, তবে 'কুপ্রভাব'-ই বা থাকবে না কেন? আমরা কি তেমন কোনো পীর-পয়গম্বর-অধ্যুষিত পুণ্যলোকে বাস করি যেখান থেকে 'সু' ও 'কু'-র দ্বন্দ্ব নির্বাসিত হয়েছে? হয়তো যাদের পাথরের মতো নিরেট, কঠিন মন তাদের মনে সুপ্রভাব-কুপ্রভাব কিছুই পড়ে না, কিন্তু সুকুমার, স্পর্শকাতর, কল্পনাপ্রবণ মনে

শুভ-অশুভের কোনো প্রভাব পড়ে না এমন কথা—বিশেষত আদম-ঈভের আপেল-ভোজনবৃত্তান্ত যে সভ্যতার পুরাণ তার অভ্যন্তরে বসে বিশ্বাস করা শক্ত বটে।

কেউ কেউ বলেন যে, টেলিভিশনে ক্রমাগত দুনিয়ার দুঃসংবাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, লড়াই প্রভৃতি দেখে দেখে পাশ্চাত্ত্য মানুষের সংবেদনশীলতায় জাড্য এসে গেছে, সংবাদচিত্রে দূরের মানুষের দুঃখ আর তার মর্মে প্রবেশ করে না, প্রকৃত যুদ্ধের শট্-কে বানানো ফিল্ম মনে হয়। এই জড়তা অবশ্য নিয়মিত সংবাদপত্র-সেবনেও আসে, তবে ছাপার অক্ষরের চেয়ে টেলিভিশনের মতো দৃশ্যগত মাধ্যমের প্রভাব যে বেশি হবে তা বোঝার জন্য পেশাদার মনোবিজ্ঞানী হবার দরকার নেই। পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, অশ্লীলতা বা হিংসাদৃশ্যের প্রদর্শন সম্পর্কে উদ্বেগও অনেকটা এই কারণেই বটে।

নাবালক-সাবালক উভয় দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমার নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলি এইরকম। প্রথমত, টেলিভিশনের পর্দায় যৌন আবেদন ছোটদের মনে নরনারীর প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তি অবশ্যই সৃষ্টি করে। এবং এ আবেদন সৃষ্টির প্রধান আঙ্গিক যেহেতু মেয়েদের ন্যাকা, বোকা এবং পাকা সাজানো, সেহেতু এক দিকে ছোট মেয়েরা আচরণের আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, অন্য দিকে ছোট ছেলেরা নারীজাতি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা পোষণ করতে শেখে ('মেয়েরা হাসির বিষয়')। এখানে আমরা একটা বিরাট বিষয়ে পদার্পণ করছি—সীরিয়াস আর্টের সততার কথা অবশ্যই বলছি না, জানপাপীদের দ্বারা পরিচালিত সুড়সুড়ির কথাই বলছি। এই সুড়সুড়ির সমস্যা বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, সাহিত্যেও আছে, কিন্তু টেলিভিশন যেহেতু গৃহাভ্যন্তরস্থিত এবং ছোটদের কাছে তার আবেদন যেহেতু সাংঘাতিক, তাই শুচিবায়ুগ্রস্ত না হয়েও স্বীকার করা যায় যে, টেলিভিশনের মাধ্যমে এই সুড়সুড়ির প্রচার ভাববার বিষয়। চতুর্দিকে যৌন উত্তেজনার উপাদান, অথচ বাস্তব জীবনে নন্দিত সংরাগের অভাব—এ তো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একটি সুবিদিত সংকটই বটে।

দ্বিতীয়ত, দুঃখদারিদ্র্য ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ছবি দেখলে অধিকাংশ লোকই এখনও বিচলিত হয়, কিন্তু যুদ্ধের সংবাদচিত্র বড়দের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ছোটরা, বিশেষত বলতেই হয় ছোট ছেলেরা, অভিনীত লড়াই আর সত্যিকারের যুদ্ধ দুটোই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে দেখে। যদি তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, যুদ্ধ ব্যাপারটা নেহাৎ রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেন্‌চার নয়, রীতিমত চোখের জলের ব্যাপার, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে—'আরে এ সব

বানানো গল্প, এরকম সত্যি সত্যি হয় নাকি?' হয় যে। যুদ্ধহীন দুনিয়া গড়ে তোলা যদি কাম্য হয়, তবে আমাদের উত্তরসূরি এই বালক সম্প্রদায়ের গঠন-দায়িত্বে আমাদের ব্যবহারিক কর্তব্য কী?

ব্রিটেনের মতো দেশের টেলিভিশন—যা চিন্তাশীল স্নাতকদের দ্বারা পরিচালিত উচ্চবর্ণের একটি প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজের, পৃথিবীর নানা ক্ষতচিহ্ন, অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ,—তা যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী এমন কথা আমি বলছি না; হিংসা বা যৌনতা সম্বন্ধে সমাজে, শিক্ষিত সমাজেও, যে 'double standard' বা পরস্পরবিরোধী দুটি মানদণ্ড অবলম্বন করার প্রবণতা বর্তমান, তার প্রতিফলন টেলিভিশনেও দৃষ্টিগোচর, এ কথাই বলছি। একদলীয় শাসনে বিশ্বাসী না হয়েও বলা যায় যে মানবিক কল্যাণের খাতিরে উপরোক্ত ব্যাপারগুলিতে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

৬

ছোটদের কথা দিয়ে এই প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম, এবং ঘুরে ফিরে তাদের কথা বারে বারেই তুলতে হয়েছে। কেন, তা পাঠকদের কাছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। সামাজিক সব প্রতিষ্ঠানই দোষে-গুণে মেশানো, টেলিভিশনও ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু টেলিভিশনের সামাজিক ভূমিকা কিরকম হওয়া উচিত, তার অবাঞ্ছিত প্রয়োগ কিভাবে এড়ানো যায়, এসব বিষয়ে পৃথিবীর সর্বত্র এবং সমাজের সর্বস্তরে বিস্তারিত গঠনমূলক আলোচনা হওয়া দরকার বিশেষত এই কারণেই যে, আমাদের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের উপরে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব পরোক্ষ নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ। শান্তির সময় সৈনিকদের কুচকাওয়াজ যেমন অধিকাংশ নাগরিকদের দৈনিক জীবনে দূরাগত ধ্বনিমাত্র, টেলিভিশন তেমন নয়। টেলিভিশন ঘরের ভিতর-কার জিনিস, ছোটদের খুব কাছাকাছি, প্রাত্যহিক খাবারের থালার মতোই তাদের করায়ত্ত। উপরন্তু, স্কুলের থেকে টেলিভিশনের সঙ্গেই তাদের আত্মিক যোগ বেশি। শিশুমানসে স্কুল লেখাপড়ার পরিশ্রমের, নিয়মানুবর্তিতার অনুষঙ্গে বাঁধা, কিন্তু টেলিভিশন শাসনমুক্ত 'home sweet home'-এর এবং ছুটির হুল্লোড়ের অনুষঙ্গে রাজকীয়। তারা সবাই রাজা তাদের এই রাজার রাজত্বে।

তা ছাড়া সমস্যাগুলি পশ্চিমে সীমাবদ্ধ থাকবে না, থাকতে পারে না। টেলিভিশনের ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। ইংরেজী বাগ্‌ধারার অনুসরণে বলা যায় যে, সে চলে যাবার জন্য আসেনি, থাকতে এসেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে

তার প্রয়োগ বাড়বে এবং যন্ত্র হিসাবে তার নব নব উন্নততর রূপ দেখা দেবে। ইলেক্‌ট্রনিক দুনিয়ায় বিপ্লবের ফলে অত্যন্ত জটিল বৈদ্যুতিক সার্কিটকেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বাঁধা যাচ্ছে। পকেট-সাইজ টেলিভিশন এখনই লভ্য, অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে টেলিভিশনকে ঘড়ি বা আংটির মতো কব্জিতে বা আঙুলে ধারণ করা যাবে। তা ছাড়া আছে দেয়ালজোড়া পর্দায় ত্রিমাত্রিক টেলিভিশনের সম্ভাবনা। বিশেষ-গুণ-সমন্বিত আলোর উৎস লেসার (Laser)-এর উদ্ভাবনের ফলে হলোগ্রাম (hologram) নামে এক জাতীয় আলোকচিত্র তৈরি করা যাচ্ছে, যা থেকে প্রকৃত ত্রিমাত্রিক ছায়াচিত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। আগে যেগুলিকে ত্রিমাত্রিক আলোকচিত্র বলা হতো সেগুলি বস্তুত নির্ভর করতো দৃষ্টিবিভ্রমের উপর। কিন্তু হলোগ্রাম ঠিক সেভাবেই আলো বিকিরণ করে যেভাবে করে কোনো বাস্তব সামগ্রী, ফলে ঘনত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত সত্যিই দৃষ্টিগোচর হয়। হলোগ্রাফিক টেলিভিশন এখনও নির্মিত হয়নি বটে, কিন্তু গবেষণা চলছে, এবং অদূর ভবিষ্যতেই নিশ্চিত এর দেখা মিলবে। তখন ফুটবল খেলোয়াড়েরা প্রায় দর্শকের ঘরের গালিচাতেই নেমে পড়বেন; ছায়াময়ী চিত্রতারকারা প্রায় ভক্তদের সোফা ঘেঁষেই হেঁটে যাবেন, বিজ্ঞানের মায়ার খেলায় জীবন ও টেলিভিশন একাকার হয়ে যাবে।

উপরন্তু, কোনো কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে এবং দর্শকেরা নিষ্ক্রিয়-ভাবে বসে বসে দেখছেন, টেলিভিশনের এই যে বর্তমান রূপ, এটাও বদলাতে বাধ্য। ভবিষ্যতে আসবে টেলিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণ ও সংযুক্ত টেলিফোন-টেলি-ভিশন। ছোট ছোট গোষ্ঠীকে ভিত্তি করে এই আদানপ্রদানের জালবুনট স্থাপিত হতে পারবে, যার সাহায্যে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করতে পারবেন। রাজনীতিবিশারদ ও ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক সভাও এ মাধ্যমেই সম্ভব হবে। টেলিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলে সমাজের একটি বিশেষ লাভ হতে পারে। দলীয় স্বার্থকে কায়েম করার জন্য বা কোনো একতরফা প্রচারের জন্য এই শক্তিশালী মাধ্যমটির একচেটিয়া ব্যবহারের সম্ভাবনা বিনষ্ট হবে এবং টেলিভিশন সত্যিই জনগণের মধ্যে আদানপ্রদানের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারবে।

সাধারণ ক্যামেরা ও ক্যাসেট টেপরেকর্ডারের মতো টি-ভি ক্যামেরা ও ভিডিও টেপরেকর্ডার (video tape-recorder)-এর প্রচলন এখনই ক্রমবর্ধমান। কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানকে রেকর্ড করে রেখে পরে দেখা তো সম্ভবই, বাড়িতেই টি-ভি ফিল্ম তৈরি করা ও দেখাও সম্ভব। যদিও এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখন পর্যন্ত মুখ্যত শিক্ষাজগতেই আবদ্ধ, তবুও উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সার্কিটের

প্রচলনের ফলে এদের দাম বছর বছর কমে যাচ্ছে এবং ক্রমশ সাধারণ নাগরিকের আয়ত্তে চলে আসছে। এ উৎপাদনে জাপান অগ্রণী তো বটেই, তৃতীয় দুনিয়াতেও এসব ইলেক্‌ট্রনিক শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল।

অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে, এক্ষেত্রে বেতারের ভবিষ্যৎ কী? তার জবাবে বলতে হয় যে, বেতারের ব্যবহার একেবারে উঠে যাবে না, সংকুচিত হলেও থাকবে। তার কারণ বেতারের কতগুলি নিজস্ব সুবিধা আছে। উদাহরণস্বরূপ, কাজ করতে করতে বা গাড়ি চালাতে চালাতে বেতারের কার্যক্রম শোনা সম্ভব, যা দৃশ্যগত মাধ্যমের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাছাড়া সংগীতের প্রচারে বেতারের বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। লঘু সংগীত এবং উচ্চ মার্গের সংগীত, দুই জাতের সংগীতের প্রচারেই বি-বি-সি-র বিখ্যাত বেতারবিভাগ এখনও টেলিভিশন-বিভাগের অগ্রবর্তী। আর যাঁরা চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন তাঁদের বলতে হয় যে, টেলিভিশনের সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী। গুণী পরিচালকেরা টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্যই ছায়াচিত্র তৈরি করবেন—টেলিভিশনের জন্য তৈরি ইংগ্‌মার বের্গমানের ছায়াছবি আমি নিজেই দেখেছি। তা ছাড়া গোষ্ঠীভিত্তিক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ভিডিওটেপরেকর্ডারের বহুল প্রচলন ঘটলে সাধারণ নাগরিকেরাই নানান ধরনের ফিল্ম নির্মাণে নেমে পড়বেন। ধনিকশ্রেণীর মালিকানায় বৃহৎ উৎপাদনের অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে চলচ্চিত্রনির্মাণ চলে আসবে ঘরোয়া পরিবেশে। সিনেমাহলও গোষ্ঠী-কর্তৃক সমবায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারবে। এসব ব্যাপারে কোনো সমাজে গুণের অভাব থাকেনা, অভাব থাকে সুযোগের। প্রকৃত গণমাধ্যম হয়ে সেই সুযোগকে সাধারণ্যে বিকীর্ণ করে দেবার ক্ষমতা টেলিভিশনের আছে।

প্রয়োগবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ভাবীকালের টেলিভিশন কম্পিউটার-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঘরে ঘরে বিশ্বকোষের মতো জ্ঞান বিতরণ করতে পারবে। বলা বাহুল্য, খবরের কাগজের বদলে টেলিভিশনই প্রধান সংবাদদাতা হয়ে উঠবে; সাম্প্রতিকতম খবরের হেডলাইন তথা অনুপুঙ্খগুলিকেও বোতাম টিপে টেলিভিশনের পর্দায় আনা যাবে। সাংবাদিকতা উঠে যাবে না, কিন্তু কাগজকে আশ্রয় না করে হবে টেলিভিশন-আশ্রয়ী। তেমনি বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও টেলিভিশনের বহুল প্রয়োগ অবধারিত।

সংক্ষেপে, শিক্ষায়, সাংস্কৃতিক জীবনে, সুরুচিসম্পন্ন প্রমোদ পরিবেশনে, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সমন্বয়জাত এই বহুমুখী মাধ্যমটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবান্বিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

কবিতায় মহাকাশ

প্রদীপচন্দ্র বসু

পায়ের তলায় মাটি, মাথার ওপর আকাশ। ওই যে সুদূর আকাশ, মেঘমণ্ডল, আকাশের নীল—কবির কল্পনা এসব ছুঁয়েছে চিরদিন। শুধু আকাশ কেন, আকাশ পেরিয়ে যে মহাকাশ, যে অনন্ত অপার শূন্যতা, যে বিশ্বচরাচর, কল্পনায় কবির মন সেখানেও গেছে। অনুভব করেছে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকে। চাঁদের জ্যোৎস্না, নক্ষত্রের আলো, ছায়া ফেলেছে কবির মানসিকতায়। বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক তার এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ-উপ-গ্রহের মধ্যে বোধহয় চাঁদকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি কবিতা লেখা হয়েছে। কিন্তু কোনো কবিই চাঁদকে কখনো একটি উপগ্রহ বলে ভাবেননি! কবিরা চিরকাল চাঁদকে দেখে এসেছেন উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসেবে। রাতের অন্ধকারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে চাঁদ কবির অনুভবকে মায়ায় জড়িয়ে রেখেছে।

চাঁদকে চাঁদ হিসেবে দেখার দায়িত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানীর। কবির কেন হবে? কবির মনশ্চক্ষে চাঁদ যখন যে রূপে ধরা দেবে, কবি সেভাবেই দেখবেন তাকে? কবির কল্পনা স্বাধীন। কিন্তু আজকের এই মহাকাশ যুগে কোনো কবি যদি চাঁদকে চাঁদ হিসেবে দেখেন তাহলে কিরকম হয়? আরো একটি প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি কি চাঁদকে দেখতে পারেন? অন্যভাবে বললে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কি কখনো কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে? এ প্রসঙ্গে বৃটেনের শিল্পবিপ্লবের সময় হার্ট ক্রেনের লেখা 'মডার্ন পোয়েট্রি' বইয়ে একটা সুন্দর উক্তি আছে: "যান্ত্রিক যুগে কবিতার কাজ হবে অন্যান্য সমসাময়িক যুগের কবিতার মতোই। কবিতা যদি না স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে যন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারে, যেভাবে কবিতায় স্বাভাবিক রূপে এসেছে গাছ-পালা, পশু, রাজপ্রাসাদ এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অন্যসব জিনিস, তাহলে বলতে হবে কবিতা এই সময়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।"

হার্ট ক্রেনের এই উক্তি নিঃসন্দেহে যুক্তিপূর্ণ। এই যুক্তি অনুযায়ী বর্তমানে স্পেস এজের কবিদের কবিতায় মহাকাশ স্বাভাবিকভাবেই আসার কথা। এই মহাকাশ কিন্তু কবির কল্পনায় দেখা মহাকাশ নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে উন্মোচিত বাস্তবের মহাকাশ। যে মহাকাশের রূপ পৃথিবীর আরো কোটি কোটি

মানুষের মতো কবিও দেখেছেন স্থিরচিত্রে বা টেলিভিশন ক্যামেরার মাধ্যমে। যে মহাকাশকে কবি জেনেছেন মহাকাশচারীদের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা পড়ে।

অন্য কোনো দেশের কবিদের কবিতায় ইতিমধ্যে মহাকাশ বাস্তব রূপরেখা ও জাগতিক অনুভূতি নিয়ে সেভাবে এসেছে কিনা জানা নেই, তবে ইংরেজি কবিতায়, বিশেষ করে আমেরিকান কবিদের লেখায় গত দেড় দশক ধরে মহাকাশের উপস্থিতি খুবই লক্ষণীয়। ১৯৫৭-তে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ রাশিয়ার স্পুটনিক মহাকাশে যাবার পর থেকে মানুষের মহাকাশ অভিযানের সাফল্য বিস্ময়কর। বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা সাধারণ মানুষকে যত আকর্ষণ ও রোমাঞ্চিত করেছে, আর কোনো বিষয় করেছে কিনা সন্দেহ! পৃথিবীর মানুষ আর কিছুদিনের মধ্যে অন্য গ্রহে গিয়ে বাস করবে, এটা ভাবলেই কিরকম অবাক লাগে। এই অবাকের ছোঁয়া লেগেছে কবির মনেও। জেমস ডিকের লেখা কবিতা "এ পোয়েট উইটনেসেস এ বোল্ড মিশন" পড়লে তা সহজেই বোঝা যায়।

"এক অর্থে ওরা সব কবি, আমাদের জ্ঞানের পরিধি
বাড়িয়ে চলেছে সীমাহীন। ওদের জন্যেই
মৃত-হিম এবং উত্তপ্ত চাঁদের আগ্নেয়গিরি একদিন
আমাদেরই মতো ভাবতে শিখবে, আর
জলহীন মঙ্গল-সমুদ্র ও শুক্রের উজ্জ্বল মেঘ
জানাবে নিজের পরিচয়।
স্থানান্তরে আমরা বদলে যাবো। আমরা ওদের সঙ্গে
থাকিনি কখনো, জানিনা ওদের ভাষা। কিন্তু
এই মানুষেরা সেসব সহজে খুঁজে নেবে,
যখন নশ্বর মনুষ্য হৃদয় নিয়ে তারা যাবে,
সঙ্গে নিয়ে যাবে প্রিয় স্ত্রী ও সন্তান, নিয়ে যাবে
ফুলের বাগান, মুদির তালিকা এবং দেখার চোখ,
কবিতা লেখার অনুভূতি···

ইতিমধ্যে মহাকাশ নিয়ে ইংরেজী কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। নাম, 'ইনসাইড আউটার স্পেস'। এই সংকলনের জন্য কবিতা লিখতে গিয়ে কবি রবার্ট কেলি বলেছেন, "আমাদের এখন চাই এমন একটি ভাষা, এমন উচ্চারণ, যা দিয়ে প্রযুক্তিকে যথাযথ প্রকাশ করা যাবে।" এর অর্থ যে ভাষাকে আমরা উত্তরা-ধিকার হিসেবে পেয়েছি তাকে আরো সৃজনশীল করা দরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-

বিদ্যা প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছে, তাঁর সঙ্গে আমাদের আপোষ করে বাঁচতে হলে, ভাষাকে নতুন করে তৈরি করে নিতে হবে। আর, এই নতুন ভাষাই হবে একবিংশ শতাব্দীর কবির ভাষা। শুধু ভাষা কেন, কবিকে অন্তরের গভীর থেকে তুলে আনতে হবে নিত্যনতুন আবিষ্কারের প্রতি তার অনুভব। সচেতনতা থাকবে না এই প্রচেষ্টায়। অন্যদিকে কবির প্রকাশ হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য। আধুনিক আমেরিকান কবিতায় মহাকাশ এভাবেই এসেছে। মানুষ যেদিন প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখলো, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রথম পাতায় কবি আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশ লিখলেন :

"Presence among us,
wanderer in our skies,
dazzle of silver in our leaves and on our
waters silver,
O silver evasion in our farthest thought—
"the visiting moon"..."the glimpses of the moon"...
and we have touched you !

মহাকাশে মানুষ থাকতে পারে ! মানুষ এখন মহাকাশে গিয়ে থাকছেও। আমেরিকার কবিরা তাই দাবি তুলেছেন, মহাকাশে কবিদেরও যাবার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু নাসার কর্তৃপক্ষ এখনই কোনো কবিকে মহাকাশে নিয়ে যেতে রাজি নন। তবে তাদের নাকি পরিকল্পনা আছে স্পেস শাটলের ভবিষ্যত কোনো এক ফ্লাইটে কয়েকজন কবি, চিত্রশিল্পী ও গায়ককে নিয়ে যাবার ! জানিনা, কবে প্রথম কবির সশরীরে মহাকাশে যাবার সৌভাগ্য হবে ? আর কেই বা হবেন সেই ভাগ্যবান ? তবে যতদিন না হয়, এই পৃথিবীতে থেকেই সংবেদি অনুভূতি ও আবেগের সাড়া থেকে কবিতায় নিশ্চয়ই লিখে যাবেন মহাকাশ বিজ্ঞানের কথা। সেই লেখায় থাকবে ভালবাসা ও মানবিকবোধ। যেমন লিখেছেন জ্যাকসন ম্যাকলো তার "টুয়েন্টি থার্ড লাইট পোয়েম" কবিতায়।

"Let them carry freight in those ships,
moon minerals scooped by machines
resistant to the ruthless rays,
not men or other sentient beings
dear to the fathomless Buddha."

মহাকাশে গেলে প্রতি মুহূর্তে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়। এই বিপদের মুখে কোনো মানুষকে ঠেলে দেবার পক্ষপাতি নন অনেক কবি। এমনকি পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণীকেও তারা পাঠাতে চান না। এই মানসিকতার জন্যেই মহাকাশে গিয়ে রাশিয়ান কুকুর লাইকার মৃত্যু ব্যথিত করেছিল কবি উইলিয়াম স্ট্যাফোর্ডকে। লিখেছিলেন তার বিখ্যাত কবিতা "ডগ এ্যাজস্লিশ"। আবার এই বিপদের মোকাবিলা করে যখন মহাকাশচারীরা সফল হয়েছেন তখন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন কোনো কোনো কবি।

"Buddy
We have brought the gods. We know what it is to shine
Far off, with earth. We alone
Of all men, could take off
Our shoes and fly.

এ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের যাত্রীরা চাঁদের পাথর কুড়িয়ে আনার পর জেমস ডিকে "এ্যাপোলো : দি মুন গ্রাউণ্ড" কবিতায় লিখলেন :

"মাটি যেন মরীচিকা আর, গোপন সময়
ওই শুয়ে আছে হাতের নাগালে···
আমরা এগিয়ে যাবো ওই পথে···
আমরা যা কিছু করি,
কালো আকাশের বুকে কেঁপে ওঠে
মানুষের গ্রহ···
আমরাই জগতের সব, একমাত্র
আমরা মানুষ···
আমাদের হাসি সব স্থির করে দেয়,
একটু সামনে ঝুঁকে আমরা কুড়িয়ে নিই
টুকরো পাথর।"

পৃথিবীর কবি পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে চিরকাল দেখেছে চাঁদকে। জ্যোৎস্না রাতে উধাও হয়েছে তার মন। কিন্তু যদি কোনোদিন এরকম হয়, পৃথিবীর কবি চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে দেখেন তাহলে তার অনুভূতিতে সেদিন পৃথিবীর ছবি কিভাবে ধরা দেবে ? এর উত্তর আছে আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশের কবিতায়।

"আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখানে সন্ধ্যাবেলা।
শূন্যতায় হিম···
এবং এখানে এই প্রথম আমরা মাথা তুলে দেখছি আকাশে
চাঁদ নয়, চাঁদের চেয়েও আরো সুন্দর, অন্য এক চাঁদ
যা খুব বিস্ময়কর আমাদের চোখে···
ওই চাঁদ, তার নির্জন বেলাভূমি, আসলে পৃথিবী
যা আমাদের বুকে জেগে আছে।"

সত্যি যদি কোনোদিন পৃথিবীর কোনো কবি চাঁদে যাবার সুযোগ পান তাহলে তার কবিসত্তা আরো সুযোগ পাবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্ম হতে! ফলে তার হৃদয়ে জন্ম নেবে অন্য মানবিকতাবোধ। স্ট্যানলি কুনিজ তখন নিজেকে ভাববেন :

restless for the leap towords island universes pulsing
beyond where the constellations set. Infinite
space overwhelms the human heart, but in the middle
of nowhere life inexorably calls to life. Forward
my mail to Mars. What news from the Great Spiral
Nebula in Andromeda and the Magellanic Clouds ?

আর রিচার্ড হুগো তখন স্বাগত জানাবেন তার একাত্ম বোধকে। ভবিষ্যতের বিশ্বে যে নতুন মানবিকতাবোধ জন্ম নেবে তার মধ্য দিয়ে ভেবে দেখবেন তিনি :

"ভ্যান এ্যালেন বলয় পার হলে আর ঝিকমিক করে না নক্ষত্র,
যেন সব উদ্ভত চাঁদ ?
আলোকবর্ষ আগে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল,
কবে যে এসেছি এখানে ? যাহোক ভেবো না, আর
ফেরা নয় ওই দুঃখ ও শোকে ভরা পৃথিবীতে ;
তিমায়িত শক্তির আধার, মুক্ত কণিকারা,
প্রাণবন্ত জেট-যান, সময়ে গলে যাচ্ছে সব···
এই গভীর শূন্যতায় সব শেষে শুধু সত্য বেঁচে থাকে
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চোখের সামনে ক্রমশই গলে যাচ্ছে দেখো !

কেন আবার বাতাসে নিশ্বাস, নেবো মাটিতে রাখবো পা,
যখন মুক্ত বুকের ভার এবং আশা-নিরাশার স্তর পার হয়ে

ভেসে যাচ্ছি দূর ওই নীলে,
যে নীল সুদূর থেকে চিরদিন ছুঁড়েছে চুম্বন।
ভুলে যাও পৃথিবীকে, পরিচিত প্রতিচ্ছবি ও যা কিছু অসৎ···
ওরা বলেছিল মহাকাশে কোথাও বাতাস নেই
তবে এটাও সঠিক জেনো দুটি নক্ষত্রের মধ্যে
কোন ফাঁক নেই, নিশ্চিত রয়েছে কিছু, যা উড়ে বেড়ায়,
একদিন যা আমাদের চোখ খুলে দেবে।
ছুঁয়ে যাবে চুল।

স্ট্যানলি কুনিজ্ঞা ও রিচার্ড হুগোর মতো আরো অনেক কবি একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের মহাকাশ বিজয়কে দেখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডোনাল্ড হল, ওয়াল্টার লোয়েনফেলস ও এস্ক জে কেনেডি। লোয়েনফেলসের এক কবিতার প্রধান চরিত্র তো ঘোষণাই করেছে ডি এন এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিন বিজ্ঞানীরা জন্ম দেবে নতুন প্রাণীর আর, চাঁদে গড়ে তুলবে বাগান। মানুষের এই অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা মহাকাশ যুগের কবিকে করে তুলছে আরো প্রাণবন্ত। তার চিন্তাধারায় গভীরতার মধ্যে এসেছে অন্যরকম ব্যাপ্তি। কবি এখন ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ার চেয়ে স্পেস শাটলের উৎক্ষেপণ দেখায় বেশি আগ্রহি। সাধারণ মানুষের মতো তিনিও এখন মহাকাশচারীদের কথা ভাবেন। ভিয়েন একারম্যান-এর একটি কবিতায় এর খুব সুন্দর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় :

"In zero gravity, their hearts will be light,
not three pounds of blood, dream and gristle.
When they were young men, the Sky was a tree
whose cool branches they climed,
Sweaty in August, and now they are the sky
young boys imagine as invisible limbs."

মহাকাশ বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও মহাকাশচারীদের যৌথ প্রচেষ্টায় মহাকাশ সম্পর্কে যে নতুন তথ্য আহরিত হয়েছে তা কবিকেও সাহায্য করেছে তার নিজস্ব বাসভূমিকে নতুন করে দেখার। তার চোখে উন্মোচিত হয়েছে পৃথিবীর অন্যরকম রূপ। মে সোয়ানসন তার "অরবিটার ফাইভ শোজ হাউ আর্থ লুকস ফ্রম দি মুন" কবিতায় মহাকাশ থেকে দেখা ভারত মহাসাগরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা চমকপ্রদ। কবির চোখে ভারত মহাসাগরকে মনে হয়েছে এক নারী যার অবয়বের

তিন-চতুর্থাংশ দেখা যাচ্ছে, যে বসে আছে গোড়ালি যুগলে ভর দিয়ে, যার খালি পায়ের পাতা ঢেকে রেখেছে আফ্রিকা। আর, ওই নারীর হাতে ধরা আছে এক পুণ্য কলস। কবির ভাষায় বাকি বর্ণনাটুকু এরকম :

"Asia is
light swirling up out of her vessel···
Her tail of long hair is
the Arabian Peninsula
A woman in the earth.
A man in the moon."

সোয়ানসনের মতোই আর্নেষ্ট সানডিন চাঁদের ধূসর দিগন্ত থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি দেখে লিখেছেন, ওই ছবি যেন এক পুরোনো বসতবাটির সামনে তোলা পারিবারিক চিত্র যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে ধূসর হয়ে গেছে।

যে কোনো সৃজনশীল ব্যক্তির মহৎ গুণ তার সমাজ সচেতনতা। এই বিচারে কবি ব্যতিক্রম নন। ফলে সব বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার নিজস্ব বোধ ও বিশ্লেষণের ওপর। আসলে কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাকে দেখছেন। এক্ষেত্রে ঠিক বেঠিকের প্রশ্ন ওঠে না। সবাই কেন এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কোন বিষয়কে দেখবেন? ভিন্নতা তো থাকবেই। মহাকাশ নিয়ে লেখা কবিতা-গুলিতেও এই ভিন্নতা আছে। মানুষের মহাকাশ বিজয়কে সব কবিই যে ভাল চোখে দেখেছেন, তা নয়। অনেক কবির মতে, চাঁদে মানুষ যাবার পর কবির কল্পনায় মায়াবি চাঁদের মৃত্যু ঘটেছে। এক কবি তো লিখেই ফেললেন :

"সারারাত ছিল দিন, বলেছিলে তুমি
দিগন্তে পৃথিবী ছিল মেঘে ঢাকা
আর, এক ভুতুড়ে চাঁদ চেয়েছিল
ট্যারা চোখে···"

মানুষের মহাকাশ চর্চার সবচেয়ে বড় বিরোধী বোধহয় কবি ডব্লিউ এইচ অডেন। এই বিরোধীতা এত প্রকট যে একটি কবিতায় অডেন আধুনিক রকেটের জনক ওয়ার্নার ভন ব্রাউনকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। এই কবির বিচারে দূর মহাকাশে রাশিয়া ও আমেরিকার কলোনি স্থাপনের প্রচেষ্টা অর্থহীন।

"Worth going to see ? I can well believe it
Worth seeing ? Much ! I once rode through a desert

and was not charmed : give me a watered
lively garden, remote from blatherers

about the New, the vou Branus and their ilk, where
on August mornings I can count the morning
glories, where to die had a meaning,
and no engine can shift my perspective."

আর এক কবি রবার্ট ভ্যাস ডায়াস চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণের দিন একটানা ধারাভাষ্য শুনতে শুনতে পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। পুরো ব্যাপারটা তাকে দিয়েছিল প্রচণ্ড মানসিক আঘাত। "জুলাই ২০, ১৯৬৯" কবিতায় সেই অনুভূতিকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি :

"সারাদিন ধারাভাষ্যকার একটানা বকে চলেছে
যুগ, প্রজন্ম ও সুদূরে পাড়ি দেবার কথা ;
বলে যাচ্ছে অতি পার্থিব, যা কিছু বিস্ময়
মনটাকে নিয়ে যায় দূরে, ইতিহাস ঘাঁটে
এবং কিভাবে অতিক্রমণের বেশ ক্রমশ
জন্ম নেয়—আমার কানে শুধু ভেসে আসছে
তথ্যের ঢেউ, যন্ত্রের শব্দ, ধাপে ধাপে চাঁদের কক্ষপথে
ঢোকার বর্ণনা আর, আমি সামনে দেখছি শুধু
ভারহীন আবহমণ্ডলে ভেসে যাচ্ছে ওরা,
পিকনিক টেবিলের মতো সাজিয়ে রাখছে
পরীক্ষার যন্ত্রপাতি।
সত্যি বলতে কি আমি আর পারছি না
এই একঘেয়ে ধারাভাষ্য সহ্য করতে
এবং আমার মনে হচ্ছে,
আমার অস্তিত্ব বুঝি ওই চাঁদ আর পৃথিবীর
মধ্যপথে ঢুকে গেছে আজ!"

এখন প্রশ্ন, মানুষের মহাকাশ চর্চা নিয়ে অনেক কবির এই বিরোধিতা কেন? অনেক সমালোচকের মতে এর প্রধান কারণ কবির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা, পৌরাণিকতা ও ভাষাগত সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাত। আগেই বলেছি, মানুষের

পদার্পণ এদের চোখে চাঁদকে পাল্টে দিয়েছে। অনেক কবির ধারণা, পৃথিবীর মানুষ যখন মহাকাশেও বসবাস শুরু করবে তখন তার অবস্থা হবে দু' নৌকায় পা রাখার মতো। এরকম অবস্থায় সে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হারিয়ে ফেলবে তার দীর্ঘদিনের পরিচিতি। পৃথিবীর মানুষের মনে তখন প্রশ্ন জাগবে, আমি কি শুধুই পৃথিবীর ? আমি কি চাঁদের নই ? মঙ্গলের নই ? এরকম সম্ভাব্য আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের কথা ভেবে লুই ভ্যান হাউটন লিখেছেন :

"And what will because of us, suffixed
in space
like the hauged man of the Tarot deck ?
Will we be lost to ourselves how
will we compensate this grandeur of
earth with most foreign cold ?"

কবি রোজমেরি জোসেফ প্রশ্ন তুলেছেন, যদি কোনোদিন মানুষ সত্যিই মঙ্গল ও শুক্রের বুকে হাঁটে, সেদিন কি সত্যিই তারা সেই মানুষই থাকবে যার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো আদম ও ইভকে ? এর উত্তর দিতে গিয়ে পিটার ভিরেক তার 'স্পেস ওয়াণ্ডারারস হোমকামিং'-এর এক জায়গায় লিখেছেন, দীর্ঘ আট হাজার বছর ধরে নক্ষত্রমণ্ডলে বাস করার পর হয়ত কোনো একদিন আমাদের কোনো এক উত্তরসূরীর মনে পড়বে তার পূর্বপুরুষের বাসগ্রহ পৃথিবীর কথা ! হয়ত পৃথিবীতে বেড়াতে আসবে সে ! কিন্তু এসে দেখবে কিছুই মিলছে না। তার কল্পনার পৃথিবীর রূপ অন্যরকম। সবচেয়ে দুঃখজনক হবে তার পরিচয় দেবার কাজ। কারণ, সে তো বলতে পারবে না সে মানুষ। মানুষ তো পৃথিবীর প্রাণী ? অন্য গ্রহের প্রাণী কি করে মানুষ হয় ? অথচ সে তো মানুষই। ফলে এক অব্যক্ত বেদনায় দুমড়ে মুচড়ে যাবে তার বুক। তখন সে হবে নিজভূমে পরবাসী।

এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস ও বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই যে অনেক কবি মহাকাশ চর্চার বিরোধিতা করছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক কবির মতে মানুষের মহাকাশে যাওয়া স্বপ্নে পদার্পণের মতো। স্বপ্নে কি কেউ সজ্ঞানে পদার্পণ করতে পারে ? করলে তো স্বপ্ন খানখান হয়ে ভেঙ্গে যায় ? আর, স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলে, বেঁচে থাকার জন্য রইল কি ? মে সোয়েনসন তার "দি এক্সপিরিয়েন্স অব পোয়েট্রি ইন এ সায়েন্টিফিক এজ" প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেছেন, "My Moon is not in the sky, but within my physic"। কবির মনকে আঘাত করার অধিকার

কি কারুর আছে ? অন্যদিকে দিয়ে বিচার করলে, কবির চাঁদ যদি আকাশের পরিবর্তে কবির মনেই থাকে, তাহলে মহাকাশচর্চার এত বিরোধীতা কেন ? কবির মনের কোণে লুকোনো চাঁদে গিয়ে তো কোনো মহাকাশযানের নাগার সাধ্য নেই !

মহাকাশচর্চা নিয়ে কিছু কবির এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই কবিরা উপলব্ধি করতে পারছেন না মনুষ্যবিহীন মহাকাশ-অভিযানের বিশাল মাহাত্ম্য। এই যে রোবট মহাকাশযান পাইওনীয়ার শুক্র, বৃহস্পতি ও শনিতে গেছে অথবা ভাইকিং গেল মঙ্গলে, এর থেকে পৃথিবীর মানুষের কি কোনো উপকার হয়নি ? ভয়েজারের তোলা বৃহস্পতি ও শনির নিখুঁত ছবিগুলি দেখে কি আমরা ওই গ্রহগুলি সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারিনি ? কবিরা নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন, মানুষ সবসময় অজানাকে জানতে চেয়েছে। বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার মধ্য দিয়ে অন্তত সেই সেবাটুকু তো করছে সমগ্র মানবজাতির। মানুষ মহাকাশে গিয়ে চিরস্থায়ী বসবাস করবে কি করবে না, তার উত্তর লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। এখনই অতো বিরোধীতা কেন ? যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসবে তখন না হয় বিশদ ভাবনা-চিন্তা করা যাবে। তার আগে পর্যন্ত কবির লেখায় শুধু থাকুক মানুষের জয়গান। রবার্ট কেলির ভাষায়,

"that human
breath will shape
utterance on the unconscious moon
wake it
& us
from the litter long dream of silence
by breath
of a man's body
by the weight of his weight
breath
breathed into the moon."

তথ্যসূত্র :

১. ন্যাশনাল আকাদেমি অব সায়েন্সেস, ওয়াশিংটন ডি. সি. কর্তৃক আয়োজিত ও নাসার সহায়তা প্রাপ্ত 'লুনার বেসেস এণ্ড স্পেস এ্যাকটিভিটিস অব দি টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরী' সংক্রান্ত আলোচনাচক্রের বক্তৃতার সংগ্রহ ; ২. স্পেস পোয়েমস —হেলেন নক্স।

পুনরাবৃত্তির পুরস্কার

পিনাকী ভাদুড়ী

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'আমার জীবনী লিখিতে হইলে আমার স্ত্রীর জীবনীও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি যাহা হইয়াছি তাহা হইতে পারিতাম না।' কথাটা আমরা কোনোদিন ভেবে দেখেছি বলে মনে হয় না। কোনো সৃষ্টিশীল কাজের আমরা যতটা মূল্য দিই, তার পেছনে যে প্রেরণা থাকে তার দাম আমরা দিই না। ইংরেজিতে একটি কথা আছে আমরা জানি—Behind every successful man, there is a woman—বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সেকথা স্বীকার করে গিয়েছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সেরকম কিছু বলেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল—মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়ণী। মৈত্রেয়ী এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধা। তিনি পার্থিব সম্পদ চাননি, চেয়েছিলেন অমৃত। কোনো স্ত্রীলোক ধন বা অলঙ্কার কামনা করছেন না, এ এক আশ্চর্য ঘটনা বটে। মৈত্রেয়ী সেজন্য নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্যা।

তাহলে কাত্যায়ণী কেমন ছিলেন? অনুমান করি, তিনি সাধারণ বৌয়ের মতোই থাকতেন, যিনি রাঁধেন বাড়েন এবং চুলও বাঁধেন। তবু তাঁর জন্যও ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে। আমরা কিন্তু চিরকাল মৈত্রেয়ীকে অনার্স দিলাম, কাত্যায়ণীকে পাশমার্কও দিইনি। তিনি সংসার করেছেন, বোধহয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দেননি, আকুল হননি অমৃত নিয়ে। কিন্তু যদি ভেবে দেখি তাহলে কাত্যায়ণীর একটি মূল্য আবিষ্কার করতে পারব। যাজ্ঞবল্ক্য যে শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থেকেছেন এবং মৈত্রেয়ী তাতে অংশ নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন—এসব কি সম্ভব হতো যদি কাত্যায়ণী না থাকতেন? মহীয়সীর মতো তিনি সংসারের যাবতীয় দায় এবং দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমের মতো যাজ্ঞবল্ক্যও বোধহয় বলতে পারতেন যে কাত্যায়ণী না থাকলে, তিনি যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না। পারতেন না মৈত্রেয়ীও। শাস্ত্রচর্চার আবহাওয়া হয়তো কাত্যায়ণীর মস্তিষ্কেও ঘূর্ণিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে তাঁকেই।

পরিচিতজনের কাছে তিনি নিশ্চয় সমাদর পাননি, কারণ তাঁর মধ্যে বৃহতের পিপাসা কেউ দেখেনি। স্বামীর সঙ্গ থেকে তাঁকে কতটা বঞ্চিত থাকতে হয়েছে, সেকথা উপনিষদকার বলেননি। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। কাত্যায়ণীকে

বোধহয় শাস্ত্রে উপেক্ষিতা বলা চলে। তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করা চলে না, কোনো বিরাটত্বের পরিমাপ করা যায় না তাঁর সঙ্গে—কেবল সযত্ন খাদ্য ও আরাম রচনা যাঁর কাজ, যিনি মহান স্বামী ও মহতী সতীনের জন্য নিশ্চিন্ত সুযোগ সুবিধাটুকু মাত্র জুগিয়ে চলেছিলেন, তিনি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হতে পারেন, কিন্তু তাছাড়া আর কিছু কি হতে পারে তাঁকে দিয়ে?

ঠিক এইজন্যই কাত্যায়ণীকে মৈত্রেয়ীর সমান আসনে বসিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। মৈত্রেয়ীর বুদ্ধি আর কাত্যায়ণীর হৃদয়, এই দুয়ে মিলেই যাজ্ঞবল্ক্য পরিবারের পৌরাণিক প্রসিদ্ধি। স্বামীকে ভালবেসেছিলেন বলেই কাত্যায়ণী সংসারের ঝক্কি ঘাড়ে নিয়ে তাঁকে জ্ঞানচর্চার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল পুঁথিগত বিদ্যার নিষ্প্রাণতা নয়, জীবনযাপনের মর্মরধ্বনি। অমৃত যে ছড়িয়ে আছে এই জীবনেই, সেকথা তিনি অনুভব করেছিলেন। সংসার নামক শিল্পটি রচনা করতে করতেই একথা তিনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যুহীন এ জীবনেই কাত্যায়ণীর ঘটেছে অমৃত আস্বাদন। অসাধারণ মৈত্রেয়ী এবং সাধারণ কাত্যায়ণী, দুজনের কেউই সামান্যা নন।

আমাদের বাড়ীতে যে জননী বা জায়া বা কন্যা নিয়ত যে কাজে রত আছেন, তাঁদের কথা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে। তাঁরাও আমাদের রোজ একই সময়ে খেতে দেন, একই নিয়মে সংসার সামলান, একই ভঙ্গীতে ক্লান্ত হন। আয়ের চেয়ে অনেক বেশী ব্যয় তাঁরা কেমন করে সামলান এ রহস্যভেদ করা মৈত্রেয়ীর পক্ষে বোধহয় অসাধ্য হতো। বিনিময়ে তাঁরা কিছু পান বলে মনে হয় না। কবে একদিন সিনেমায় যাবো অথবা সন্ধ্যায় কাজের ফাঁকে ইডিয়ট বক্সের সামনে বসবো—এই ক্লান্তিতে তাঁরাও আক্রান্ত। রোজ কী রান্না হবে—এই প্ল্যানিংয়ের কাজটা যে কি দুঃসহ এবং দুরন্ত একথা আমি অনেক মহিলার মুখেই শুনেছি। দিনের শেষে আমরা যখন ঘরে ফিরি, তখন একই লোকের সঙ্গে সারাদিন একই কথা বলে আমরাও ক্লান্ত। খেতে বসে কত সহজে ঐ খাবার আমরা ঠেলে সরিয়ে দিই, তখন এঁদের যে নিঃশ্বাস পড়ে, তার মতো উত্তপ্ত আর কি? অথচ এঁদের সমস্ত জীবনই কাটে বড়ো একঘেয়ে কাজের মধ্যে; যা আমাদের সংসার চালিয়ে রেখেছে। এইসব কাজে অনবরত যে মনোযোগ দিতে হয়, প্রতি মুহূর্তে যে তপস্যা প্রয়োজন, তা মনে করলে এঁদের প্রণাম নিবেদন না করে উপায় নেই। অনেক সন্ন্যাসীর শক্তিকে এঁরা পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন। সেই যুবক সন্ন্যাসীর দম্ভের গল্পটি স্মরণ করা চলে। বারো বছর কঠোর যোগাভ্যাস করে সন্ন্যাসী বিশেষ

শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। শুধু দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই তিনি কাক-বক ভস্ম করতে পারতেন। একদিন তিনি এক গৃহদ্বারে ভিক্ষা করতে গেলে গৃহের কর্ত্রী ভিতর থেকে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। সন্ন্যাসী এতে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর যে কী ক্ষমতা, তা কেউ জানে না বলেই তাঁকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখার স্পর্ধা দেখাতে পারে। আশ্চর্যের কথা, তাঁর এই মনে মনে অহংকারের উত্তরে শোনা গেল—'এত অহংকার করিও না, এখানে কাক বা বক নাই।' সন্ন্যাসী স্তম্ভিত। মহিলা এ কথা জানলেন কি করে? পরে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সেই মহিলা বলেছিলেন—'আমি একজন সামান্যা নারী। তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমি পীড়িত স্বামীর সেবা করিতেছিলাম। ইহাই আমার যোগাভ্যাস।' আমাদের ঘরে ঘরে প্রতিদিন এই যোগাভ্যাস আমাদের পরিবারের মহিলারা করে থাকেন।

এই রোজকার পুনরাবৃত্তি থেকে মানুষের মুক্তি নেই। যেদিন থেকে সময় আবিষ্কৃত হয়েছে সেই দিন থেকেই এই দুর্গতির সূচনা। আদিতে ছিল যে মহাকাল, তা এখন শুধুমাত্র সময়, ঘড়িতে কাঁচের নীচে ধরা থাকে অখণ্ড সেই রূপকারের খণ্ডিত স্বরূপ। আগে আমরা সময় বলতে বুঝতাম সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ন—অথবা গ্রীষ্ম বা বর্ষা বা শীত অথবা বসন্ত। কিন্তু এখন ঘড়িতে সেকেণ্ড মিনিটেরও অনেক দাম—সময় নষ্ট করার মতো সময় কোথায়? হাক্সলি বলেছেন, যেদিন থেকে মানুষকে ট্রেন ধরতে হচ্ছে, সেদিন থেকে সময়ের মানেই বদলে গেছে। ৬টা ১০-এ যদি কোনো ট্রেন ছাড়ে তবে ঐ মুহূর্তটাই ভীষণ জরুরী। শীতের আলস্য বা গ্রীষ্মের ক্লান্তি বা বর্ষার অসুবিধে কোনোটাই কিছু নয়, ৬টা ১০-ই হল লক্ষ্যমাত্রা। এমনিভাবে শিল্পবিপ্লবেরও দাম দিতে হচ্ছে আমাদের। কলে-কারখানায় সিফ্‌ট সুরু হবার আগে যে সাইরেনের আর্তনাদ শোনা যেতো তা এখন অন্য কারণে বন্ধ হলেও, আমাদের বুকের মধ্যে সেই আর্তনাদ সমানে ধ্বনিত হতে থাকে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষকে ঢুকতে হবে পিঞ্জরের গোগ্রাসী হাঁ-এর মুখে। তারপরে সারাদিন ধরে চলবে সময়ের সঙ্গে লড়াই। সময় মেপে হিসেব করা আছে, এক তালের পরে দুতাল, দুতালের পরে তিনতাল। সময়ের আগেই ছিনিয়ে নিতে হবে সময়। এনে দিতে হবে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ ফল। দিন নেই, মাস নেই, বছর নেই, সেই একই পুনরাবৃত্তির জোয়াল। যেসব কাজে প্রতিমুহূর্তেই কোনো ফল দেখাতে হয় না—যেমন অধ্যাপনা অথবা ঐ রকম কিছু—সেখানে পুনরাবৃত্তি হয়তো এতটা উদ্বেগ-

জনক নয়, যদিও ক্লান্তিকর। কিন্তু যেখানে পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকতার একঘেয়েমি জড়িত, তা আরো গ্লানিময়। এই সঙ্গে যুক্ত আছে কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানোর তাগিদ। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই লেখা একটি কবিতায় ঐ তাগিদের উৎকণ্ঠা কেমন ধ্বনিত হয়েছিল, সেটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে—

চাকরি গেল, চাকরি গেল, চাকরি রাখা বিষম দায়
ঐ গো বুঝি নটা বাজে, ঐ গো বুঝি চাকরি যায়।

এই পুনরাবৃত্তির দুঃখ আমাকে যে শুনিয়েছিল তার নাম অমূল্য। এর নামটা আমার কাছে অর্থবহ বলে মনে হয়েছে, কারণ এ আমাকে একটি মহামূল্যবান তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে। সে এই বলে দুঃখ করেছে যে একই কাজ করে বলে তার কোনো উন্নতি হয় না। আমি বুঝতে পারলাম যে সত্যিই একঘেয়ে কাজের কোনো দাম দেওয়া হয় না। যে কাজ রোজ করতে হয়, মনে হতে পারে যে তার জন্য অভ্যাসই যথেষ্ট। কিন্তু সত্যিই যখন এ কাজ প্রতিদিন করে যেতে হয়, তখন শুধু শারীরিক অভ্যাসই কাজ করে না, তার জন্য মানসিক শৃঙ্খলাও একটি উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। রোজই একইভাবে হাঁসফাঁস করতে হাঁপানী রুগীও ক্লান্ত হয়ে পড়ে—এতো সুস্থ মানুষ। রোজ একই সময়ের মধ্যে পৌঁছে, একই কাজের জোয়াল তুলে নেওয়া, এমনকি কথাও যা বলতে হয়, তাও প্রায় একই। আমাকে একটি ছেলে বলেছিল যে বছরের প্রথমদিনে আমি বলে দিতে পারি সে বছরের শেষ দিনে কি কথা বলবো। বাইরে থেকে শুনলে হাসি পেতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে মর্মান্তিক সত্য আর কিছু হতে পারে না। কাজ থেকে মানুষ শুধু আর্থিক রসদ জোগাড় করে তাই নয়, তা থেকে সে শান্তিও চায়, স্বীকৃতিও চায়। পৃথিবীতে শিল্পযুগ শুরু হবার পরে সভ্যতা এগোতে চাইছে রকেটের গতিতে—কয়েক হাজার বছরে যা পারিনি, একশো বছরে তা সুদে-আসলে তুলে নিতে হবে। এইটাই মানুষের পণ। দাঁতে দাঁত দিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরতে মরতে চলা—এই হলো শিল্পোদ্যোগের অভিশাপ। শিল্পের কাজ দ্রুত এবং নিশ্চিত করার ব্যগ্রতায় সব বড়ো কাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। এক একজন তাই এক একটা টুকরো কাজই করে। সেসব কাজ নিয়মিত করে যাওয়া তো বটেই, নিয়মিত তাকিয়ে দেখাও ক্লান্তিকর। এই নিয়ে বহুদিন আগে দুঃখ করেছেন চার্লি চ্যাপলিন তাঁর 'মডার্ণ টাইমস্' ছবিতে। দুঃখটা অবশ্য হাসির মোড়কে ঢাকা ছিল, কারণ তিনি শিল্পী। ব্যঙ্গের ঘা মেরে তিনি জিতে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা যারা শিল্পী নই, তাদের কি হবে?

আমরা কাজ করি কেন? প্রথমত, টাকার জন্য। কিন্তু সম্মান, স্বীকৃতিও ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠে। যদি টাকা এবং স্বীকৃতি এই দুই অক্ষরেখা নিয়ে একটি গ্রাফ টানা যায়, তবে দেখা যাবে স্বীকৃতি যদি ঊর্দ্ধমুখী না হয়, তবে ঐ গ্রাফ একটি অনুভূমিক সরলরেখা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

এই যে লেখাটা আমরা পড়তে পারছি, এটা কি সম্ভব হতো, যদি বারে বারে এর প্রুফ না দেখা হতো। প্রুফ রিডিং একটি জরুরি এবং পৌনঃপুনিক কাজ যা নেপথ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, যার অস্তিত্ব আমরা স্বীকারই করি না। কিন্তু এই কাজে ভুল হলে পুরো ছাপাটাই ভুল হয়ে যাবে।

কারখানায় প্রতিদিন যেসব বস্তুর উৎপাদন হচ্ছে, তার গুণাগুণ নির্বারণ করার জন্য একদল প্রতিনিয়ত কাজ করেন। সমস্ত জিনিষের মাপ ঠিক আছে কিনা, না থাকলে কতটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে, এই ধরনের কাজ রোজ করতে হয় এবং এর উপরেই নির্ভর করে থাকে একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদনের সম্ভাবনা। এখানে সামান্য ভুল পরবর্তী অথবা উপান্ত উৎপাদনে প্রতিফলিত হয়ে সব নষ্ট করে দিতে পারে। অথচ এই কাজ রোজ যাঁরা করেন তাঁদের ভূমিকা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যে-সব মহিলারা রেডিও এ্যাসেম্বলির কাজ করেন, রেডিও শোনবার সময়ে তাঁদের কথা আমরা মনে করি না। এই রকম প্রত্যেকটি কাজের কথাই বলা চলে। রঙের কারখানায় যে মানুষটি সারা দিন স্প্রে-গান্ চালায়, তার মুহূর্তের ভুলচুকে কাজটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে বস্তু রং করে দিচ্ছে, যা বিক্রির একটি আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মেয়েদের সেলাই, প্রতিদিনের অসুখের সেবা, বাস-ট্রামের কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার —এঁদের প্রতিটি কাজই নিরন্তর আমাদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। অফিসের টাইপিস্ট বা স্টেনোগ্রাফার, পাওয়ার স্টেশনের লগ্ বুক যে লিখে রাখে— এরা সকলেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ নির্বিঘ্ন করে যাচ্ছে। এদের প্রতিটি কাজে প্রতিদিনই শুধু একইরকম নয়, বোধহয় রোজই কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণে মনোযোগ দেওয়া দরকার হয়। নচেৎ এ কাজ মান বজায় রেখে করে যাওয়া সম্ভব হয় না। টলস্টয় তাঁর আশি বছরের দিনপঞ্জিতে বলেছিলেন—'পনেরো বছর বয়সে আমি যা করতাম, এখনো আমি তা-ই করছি, একইরকম উৎসাহের সঙ্গে—চেষ্টা করছি নিজের উন্নতি করতে,—to improve myself? টলস্টয়ের মতো করে এরা কেউ এ কথা বলতে পারে না, কারণ সে স্বীকৃতি এদের নেই, সে উচ্চতায় এরা ওঠেনি, তবু চেষ্টার ধরনটা একই। যে সেতার বাজায় তাকে দিনে আঠারো

ঘণ্টা রেওয়াজ করতে হয়। তাকে আমরা মালা পরাই, কারণ তার কাজটা ক্রিয়েটিভ, কিন্তু প্রতিদিনের কাজটা ক্রিয়েটিভ নয় বলেই তার প্রাপ্য শুধু উদাসীনতা? এটা আমরা দেখেছি যে এসব কাজে ত্রুটি ঘটলে সর্বনাশ না হোক, ক্ষতি তো হবেই। এসবের উপরেই ভর দিয়ে চলেছে সংসার—রাজা মন্ত্রী তো থাকে না, থাকে জেলে-ডিঙী, চাষীর হাল। আমি জানি না এর পুরস্কার কি হতে পারে। কিন্তু কেবল খাওয়া পরার জন্য অথবা/এবং উপকরণ সংগ্রহের বুদ্ধিহীন, ক্লান্তিকর কাজ মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে, এটাও কোনো ভালো পরিণাম নয়।

প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিমান হয়েও মানুষই পড়েছে ফাঁদে। তার অন্নচিন্তা সত্যিই চমৎকার। কেবল অন্ন নয়, তার অন্য চিন্তাও আছে। জীবন সাজাবার জন্য তার নানা উদ্যোগ। এসবই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এক উদ্বেগ থেকে অন্য উদ্বেগে। সকালবেলায় পাখী বেরোয় খাবারের খোঁজে, কিন্তু তার কোনো ঘড়ি ধরা চাপ নেই, সে ওরই ফাঁকে আকাশে পাখা ভাসিয়ে দিয়ে আলোর সন্ধানে যাত্রা করে। 'পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান', আর মানুষ তার স্বরকেই গানে রূপান্তরিত করতে পারে, এই বলে কবি মানুষের জয়গান করেছেন। কিন্তু পরিহাসের কথা হলো এই যে, পাখী তার সীমিত গান রোজই গাইতে পারে, মানুষের তো রোজ গান শোনারও সময় হয় না। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়—দিকে দিকে সৌন্দর্যের সমারোহ—গাছ কেমন নিঃশব্দ বর্ণময় পুষ্পে সেজেছে, আকাশে কেমন দৃষ্টি মেলে রেখেছে তারা। পথের বেড়ালটা কেমন ঢুলকি চালে হাঁটছে, কারো যেন ত্বরা নেই, মানুষেরই সামনে শুধু আসন্ন জরা। তাকে শুধু কেড়ে নিতে হবে। আধুনিক কবি বলেছিলেন—'রুটিন দিয়ে জীবনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেও একটু রেখো অলস অবসর/ধনধান্যে বসুন্ধরা ভরেও যেন থাকে একটি শুধু বন্ধ্যা বালুচর।' রুটিন-বাঁধা কাজ যে বিরক্তিকর তা আমরা জানি, কিন্তু তা আরো দুঃখের হয় যখন ঐ কাজকে আমরাই উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি না। যে কাজ করে বেঁচে থাকতে হবে, সেই বেঁচে থাকা দুঃখকর হয়ে উঠছে ঐ কাজেরই জন্য—এর চেয়ে বড়ো-পরিহাস আর কি? ঘরে এবং বাইরে কাজের দাম না পাওয়া গেলে পরিস্থিতিকে বিপজ্জনকই বলতে হবে। পুরুষ এবং নারী, উভয়ে যদি শুধু অভ্যাসের নীরস পুনরাবৃত্তিই করে চলে—এক চাকাতেই বাঁধা—তবে তো জীবন হবে প্রেমহীন এবং বিবর্ণ —রোজকার ক্লান্তিকর যৌনতা দিয়েও তাকে সরস করে তোলা যাবে না।

যাঁরা শিল্পী, বিজ্ঞানী হন—অর্থাৎ বিশেষ কাজ করেন, তাঁদের কাজেই তাঁদের সুখ। কেননা তাঁদের প্রতিটা কাজই নতুন। সাফল্যের আগে অনেক দুঃখও তাঁরা পেয়ে থাকেন, তবু কাজের নতুনত্বই তাঁদের সাহস যোগায়। আর স্বীকৃতি যদি আসে তবে তো দান জিতেই ফেলা গেল। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তো এরকম সম্ভাবনা থাকে না। সংসারে যে মা সারাদিন পরিশ্রম করে সবাইকে খাইয়ে, নিজে অল্প খেয়ে হাসিমুখে থাকেন, যে বৌ তালি দিয়ে দিয়ে পরিবারের ইজ্জত বাঁচায়, তাদের নামে হাততালি তো দিতেই হবে। নয়তো কিসের জন্য এই অন্তহীন পুনরাবৃত্তের অনন্ত আবর্তনে সামিল হবে এরা? জীবন শুরু করার উৎসাহ কেন জীবন শেষ করার সময়ে এমন মিইয়ে পড়বে, কেন মনে হবে কোথাও ভুল হয়ে গেছে? বঙ্কিম তাঁর স্ত্রীর কথা বলেছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন বলে আমরা জানি না।

আসলে আমাদের জীবনে গতির বড়ো জয়জয়কার—কে কত জোরে ছুটতে পারে—শুধু মাঠে নয়, জীবনেও। যেতে হবে আগে, কোথায় জানি না, কতদূরে জানি না, শুধু আগে। কে সবার আগে পাশ করবে, কে উপার্জন করবে সবার চেয়ে বেশি, গতি শুধু আমার একলার নয়, আমায় আপেক্ষিক ভাবে অন্যের চেয়ে গতি বাড়াতে হবে। সেজন্য যত প্রাণহীন কাজেই নিজেকে বলি দেওয়া হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এইজন্যই আমাদের প্রতিদিনকার কাজ আলাদা করে কোনো দাম পায় না। বরং সভ্যতা যাদের কাছে পূর্ণবেগে পৌঁছয়নি, তারা এখনো তাদের কাজেও রেখেছে ভাললাগার ছোঁয়া। সাঁওতাল ছেলে মাঠে যাবার সময়ে বাঁশিটি নিতে ভোলে না। সাঁওতাল যুবতী (আমি হায়দ্রাবাদে শ্রমিক রমণীকেও দেখেছি) মাথায় ফুল গুঁজে নিয়ে কাজে বেরোয়। কলকাতায় রাজমিস্ত্রীর যোগানদার কোন মেয়েকে দেখেছি মাথায় পরেছে লাল টকটকে ফুল।

লজ্জার সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে জন্তুরা মানুষের চেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। খিদে পেলে খায়, যখন চায় তখন সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হয়, যখন সবাই দৌড়চ্ছে, তখন সে বিলাসের নিদ্রায় মগ্ন হতে পারে। মানুষ তার স্বাভাবিকতাকে ছাড়াতে পেরেছে বলেই অবশ্য এখানে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু তার স্বাভাবিক তৃপ্তি কি ক্ষুণ্ণ হয়নি?

এই একঘেয়ে কাজের বিপদ আমাদের শিশুদেরও তাড়া করেছে। তারা যখন খেলতে চায়, তখন তাদের পড়তে হয়। পরীক্ষায় ভালো নম্বরের জন্য তাকে ছাড়তে হয় তার যা ভালো লাগে তার সবটাই। বড়ো হবার, ভালো লাগার,

তাকিয়ে দেখার মন একটু একটু করে চুরমার হয়ে যায়। মজার কথা এই যে পরীক্ষায় ভালো নম্বর তাকে পেতে হয় যাতে সে একটা বড়ো দরের নিষ্প্রাণ কাজ করতে পায়।

এসবের জন্য কেউ পুরস্কার দাবি করে না। শুধু মেনে নেয়। রোজই পৃথিবীতে একটি সুন্দর সকাল হয়। তা একটু পরেই হয়ে ওঠে তিক্ত। বাড়ির বৌ রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে প্রার্থনা করে—আর যেন ভোর না হয়—মৃত্যুর কামনাতে নয়, পুনরাবর্তনকে সইতে পারছে না বলে। ভোর হলেই সেই সংসার যাপন, কোনো কোনো মহিলা আবার অফিসেও বেরোন, সে-ও কবে নিরানন্দময় হয়ে উঠেছে। বাড়ির পুরুষটি জেগে ওঠে আরো ক্লান্তি নিয়ে। একখুনি রোদ চড়ে যাবে খুনির মতো—তার হাত থেকে পালিয়ে সেই পচে যাওয়া জীবিকার দরজাতেই ঢুকে পড়তে হবে। তারপর সারাদিন সেখানে কেঁপে কেঁপে ওঠা। সন্ধ্যায় মুক্তি মনে করে বাড়ি ফেরা—ভুল হয়ে যায় যে কাল আবার ঘুম ভাঙলেই যন্ত্রণা।

তবে আমাদের বাঁচবার অযুত কে যোগাবে? শিল্পযুগের যা অভিশাপ সেই নেশার কষায় স্বাদই আমাদের পরিণতি হতে চলেছে? রোজ আকাশে যে তারাটি ওঠে আরো দেখবো বলে, তাকে কি দেখা হবে না? রোজ ঘুম ভেঙে বিছানায় যাকে দেখি, সে কে তা কি জানাই হবে না?

রোজকার কাজের চারণগাথা কে গাইবে? মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কাত্যায়ণীকেও বসাবে একাসনে?

পার্থসারথি চৌধুরীর কবিতা

গৌতম গুপ্ত

পার্থসারথি চৌধুরীর কবিতা আজকাল চোখে পড়ে কম। পঞ্চাশের শুরুতে লিখতে শুরু করে তিনি প্রবল পাঠকপ্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ঐতিহ্যের তদ্বিষ্ট সংশ্লেষে, তৎসম শব্দের শিকড় সন্ধানী ব্যবহারে, তার কবিতা তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে মনে করিয়ে দিত। অচিরেই নিজস্ব এক কাব্য-ভাষায় সুস্থিত হলেন, আমাদের আগ্রহ বাড়ল। কিন্তু তারপরই তার লেখা গেল কমে। গত এক দশকে বদ্ধ হয়ে যাওয়া মাসিক কৃত্তিবাসে কয়েকবার ও দেশ পত্রিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা ছাড়া তিনি তেমন করে আর আমাদের চোখে পড়েননি! ক্রমশ তার লেখা এতই কমে এসেছে যে সাম্প্রতিকের চোখে তিনি যদি নতুন একটি কবিনাম হিসাবে প্রতিভাত হন তাহলে দোষের হবে না। অথচ পঞ্চাশের দশকে তার সমান ছন্দ পারঙ্গম শব্দ মেধাবী কবি খুব বেশি আসেননি। বলা বাহুল্য উল্লেখযোগ্য সংস্মরণসফল কবি বেশ কয়েকজনই এসেছেন।

প্রথম থেকেই পার্থসারথি ব্যবহারিক খ্যাতি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। তার দর্শনগম্ভীর আত্ম-সংশ্লেষণার কবিতা একবার পাঠেই বোঝা যাবে এমন নয়। পাঠক তার কবিতা পড়েই প্রশংসা বা নিন্দায় উচ্চকণ্ঠ হবে, সেটা যে কবির একান্তই অনভিপ্রেত, মনস্ক পাঠকের কাছে তা অলক্ষ্য থাকে না। আটপৌরে লোকসফলতা থেকে তিনি সম্ভবত দূরে থাকতে চেয়েছেন! কোনো কোনো সময় এই অতি আভিজাত্যবোধ, এই পরিহারপ্রিয়তা আমাদের আরোপিত মনে হয়েছে, এই দূষণ তাকে দুরূহও করে তুলেছে বেশ খানিকটা। বাংলা কবিতার পরিশ্রমী যোগ্য পাঠক তখন আর তেমন কোথায়।

সুখের বিষয় এখানে মুদ্রিত ছ'টি কবিতায় তিনি প্রবলভাবে আবার ফিরে এসেছেন। ঐতিহ্য ও ধ্রুপদী মানসের প্রতিফলন থাকলেও এই কবিতাগুলির ভাষার বহিরঙ্গ থেকে সর্বপ্রকার ভণিতা গেছে সরে। এক গভীর তন্ময় বিষাদময়তা, যেখানে মৃত্যুচেতনাও উঁকি দেয়—এই কবিতাগুলিতে তা বারে বারেই ফিরে ফিরে এসেছে। কবির সাধনাসিদ্ধ পূর্বাশ্রমের তির্যক বাক্যবন্ধও এখনো দু-এক জায়গায় লক্ষ করা গেছে, কিন্তু সত্যিকার ভালো কবিতা পাঠের আনন্দে তা যেন একধরনের নন্দন-নিমন্ত্রণ। বোঝা যায় মধ্যবর্তী দীর্ঘ নীরবতায় তার শব্দতপস্যার বিরাম ঘটেনি। প্রকাশিত প্রায় সবকটি কবিতায়ই তিনি সেই "প্রথম পার্থ" যার অর্জুনতূণীর থেকে সবকটি তীর পাঠককে বিদ্ধ করে, তাকে প্রাপ্তির খুশিতে প্লুত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জীবযাত্রা

এই যে পাহাড়ী ঘাসে বুক চেপে শুনেছি গোধনঘণ্টা,
এই যে প্রবল শীতে বাংলোর পর্দায় খুঁজেছি উষ্ণতা,
লঙরখিচুড়ি কিছু কোনোমতে লঙ্কা ও পেঁয়াজে
পেয়েছিল রসনার রাজী,

ভুলেছি ফেরার পথ, পাকদণ্ডী ঢাকা ছিল বিষুব উচ্ছ্বাসে—
সব যেন শেষ কোনো পরমার্থে যাবে।

এভাবেই জীবযাত্রা,
এভাবেই দীনের অধম দীন,
এভাবেই পড়ে পাওয়া।
সংস্কার মননে থাকেনি,
কিম্ভূত গৌরব ছিল,
মানুষের মাংসগন্ধে মত্ত দিনে হৃদয়ের মেটুলি চেয়েছি।

হায় ছলোছলো আয়ুকাল,
তুমি বড়ো ধন্দে ফেলে গেলে।

চারিদিকে চেয়ে থাকে অকাট্য বিশ্বাস,
তবু এমন সামান্য লাভে জীবন কাটাবো,
এমন ত্বকের সুখে জুড়িয়ে ফুরাবো—
এর তুল্য পরাজয় স্মৃতিজীবী সহ্যের পীড়ন।

ঘুরেছি অচেনা পথে,
কেঁদেছি প্রণয় পেয়ে তার সঙ্গে অনিবার্য পাঁজরে দহন।

তবু এ জীবন সুখে গেছে।
তারার ভাবনা আর প্রমাদে টানে না,
যে রমণী ছেড়ে গেছে তার জন্য ক্ষমা,
যে এসেছে তার জন্য অনুকম্পা ভয়।

এতোদিন বাঁচাবাঁচি তবু কণ্ঠে শ্বাস রুদ্ধ হয়।

মুখ

কবে হবে ধারণসম্ভবা ?
চোখের আলো কি গেছে মরে,
সর্বনাশ অর্থশূন্য আখরে আখরে।

দেখা তো হয়েছে মুখ একবার কতোবার শতশতবার,
তবুও বিচ্ছেদে নিত্য পূর্ণ পরাজয় অন্ধ ধারণার।

আমি শুধু আনন চেয়েছি,
গ্রীবামূল স্তনভার জঘনপ্রসার
আর কারো হতে পারে সবিশেষ নয় তো তোমার।
মুখে তুমি অনুপমা, একমাত্র মুখে,
ললাটে অলকে চোখে স্ফিতনাস ঠোঁটে ও চিবুকে
একান্ত আপন তুমি নিজস্ব বিধুরা
চোখের অতলে রাখো মগ্ন তানপুরা।

হে আমার নির্বাচিত মুখ,
ফিরে এসো, ধ্যানে এসে সারাও অসুখ।

এতো কিছু মনে আছে
মুদিত আঁখির মধ্যে কতো কিছু নাচে—
বৃক্ষদেহ, মেঠো পথ, মেঘমায়া, জঙ্গলের রেখা,
আরো কতো মগ্ন টুকিটাকি,
অকারণে দরশন, অলস প্রহরে খেলা, ফাঁকি।

শুধু সহজ বিচ্ছেদে তুমি নও পুনর্ভবা।
কবে হবে ধারণসম্ভবা ?

তোমার মুখ কি নিল অন্তরের গভীরে বসতি
যেখানে ধূপের গন্ধে নীরব আরতি,

আমরণ অধিষ্ঠান, স্নানযাত্রা নেই।
অচলপ্রতিষ্ঠা বুঝি দেখা ফুরালেই।

বিফল জেনেও নিত্য মুখ তোরে ভাবা,
কবে হবি ধারণসম্ভবা।

এসেছো জুড়াতে

জুড়াতে এসেছো যদি মনে কেন পুষে রাখো খেদ,
মগ্ন হও ভুলে যাও মূর্খ ভেদাভেদ।

এসেছো জলের ধারে জলতলে হৃদয় বিছাও,
হলুদ ফুলের গাছ চেয়ে দেখ, হাসিটুকু নাও।
এ সকালে পরিব্যাপ্ত আকাশের আলো
চরাচরে কী সহজ লাবণি মাখালো।
তুমি শুধু বারংবার ফিরছো হিশেবে ?
জানো না সবাই রিক্ত, কে কাকে কী দেবে।

জুড়াতে এসেছো যদি মেনে নাও প্রকৃত সন্ন্যাস,
শান্ত হবে জ্বরতপ্ত ভিক্ষকের ত্রাস।
যা পেয়েছো অনায়াস পথের ধূলায়
চেয়ে দেখো, জেনো এই পথই নিয়ে যায়
খেয়াঘাটে, অন্যতীরে, বনানী ছাড়িয়ে।
চলমান জীবনযাত্রা বেঁচে থাকে সতত হারিয়ে।

অভ্যাসের আহরণে দিন যায় নশ্বর কুড়াতে।
এবার নির্লোভ থামো, মনে রেখো এসেছো জুড়াতে।

সফলতা

যায় না জীবন কারো বিফলে।
প্রান্তর জোগায় সুধা তরু আর মুকুলের ভিড়ে;
বাতাসে প্রাণের তৃপ্তি
বেশবাসে এলোমেলো টান ভালোবাসা।
যায় না জীবন কারো বিফলে।

পেয়েছি বলেই এই অনাদর;
লোভের পিছল পথে স্থিতির আশ্বাস নাই;
কেশপাশ মেলে ধরো অবিরাম সময়ের ধূপে।
এই বনতল জলাধার নীলকান্ত বিপুল আকাশ,
আবার প্রান্তর নিরন্তর সুরের যামিনী—
এতো সব মাখামাখি।
যায় না জীবন কারো বিফলে।

আদিগন্ত মুক্তি নিয়ে ধরার বিস্তার,
আমৃত্যু বিরহতিথি,
উত্তরীয় স্বাদু জল শ্রমের প্রসাদ।
তোমার প্রণয় হোক বিরাগের মধ্যস্থ নির্বেদ,
দেহতাপ শুষে নিক লতার ওষধি
যায় না জীবন কারো বিফলে।

যত্নের প্রলেপে চারু মৃন্ময় প্রাঙ্গণ;
স্বভাবশিলীত বিশ্ব চালচিত্র চারু,
অনায়াস জীবনের শিল্পের গৌরব
ধরে রাখে নারী ভ্রম রতি শান্তি বিষাদ আহ্লাদ।
যায় না জীবন কারো বিফলে।

নির্মোহ

নখরে ছিঁড়িনি অনুরাগ,
ধরেছি চিকনপাতা মুগ্ধ করপুটে।
উহাদের তেলাক্ত বিস্ময়
হার্মাদের দস্যুতা হরেছে।

আজ বড়ো অভিমানী রিক্ত মনে হয়,
ভুল পথে উড়ে গেছে অমরার আমন্ত্রণখানি।
স্বার্থসন্ধ দন্তের নির্ভর
সেও ভেঙে পড়ে অতঃপর।

নখরে ছিঁড়িনি অনুরাগ,
চিক্কণের মাধুকরী মায়া
এনেছে বিজনে অবসানে।
নতমুখ আকুল প্রমাদ, তাও এলো কাছে।
নীরব সন্ধ্যার মেঘে সমাকীর্ণ এ বিফল যাগ।
কেন নখরে ছিঁড়িনি অনুরাগ।

যাত্রা

বর্ষার ভরা জলে
নদীটি পুরুষ্টুকায়া।

মনে পড়ে নৌকো ছিলো বাঁধা
হিজলের ছায়ার আশ্রয়ে,
হিজল অথবা গাব,
হতে পারে জারুল গরানও।

হে আমার অবহেলা নষ্ট দিন
প্রতারিত প্রকৃতি পুরান।

আমি ডাঙার গরিষ্ঠ রঙ্গে
তারপর দশক জুড়াই।
ঘুরিফিরি মহুয়ার শাল আর পিয়ালের দেশে।

মানুষী চিনেছি ক্রমে
শীতরাতে দাবদাহে অঝোর শ্রাবণে।
আমারে দিয়েছে এনে
অন্যমনা ক্ষুধার আহার
কাঁসার গেলাসে জল,
মার্জনার অনুরাগে বিহ্বল পিত্তল।

আমি সন্ধ্যাকাশে সভয় চেয়েছি,
আমি মেঘ ফুঁড়ে আলোর মিনার দেখি বাঁকা
উত্তরীয় ফেলে দিয়ে
বিরাগী পথের ধুলো মাখি।

জলের কল্লোল আর পথের নীরব
এক সঙ্গে রাখি।

With Best Compliments From :

A WELL WISHER

পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক বনসৃজন
আজ জন আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে

* গ্রামীণ জনসাধারণের জ্বালানী, পশুখাদ্য ফল-ফলাদি আর কাঠের প্রয়োজন মেটাতে
* পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উৎপাদনকে জনসাধারণের সঙ্গে ভাগ করে নিতে
* সমাজের কল্যাণে পতিত জমিকে উন্নত করে তুলতে
* জীবনযাত্রার মান আরও সুন্দর করে তুলতে

জনগণের সহযোগিতায় ১৪০,০০০ হেকটেয়ার পতিত জমিকে তরুশ্যামল করে তুলে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগতির এক অনন্য স্বাক্ষর রেখেছে।

বনবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ২৮৬৭/৮৯

BIVAV

Price : Rs. 10·00
Vol. 12. No. 3

45th Issue
April—June 89
Published in July 89

Reg. No.
R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970—1885

নিশ্চিত সাফল্য

১ টাকার বিনিময়ে
সপ্তাহের প্রতি বুধবার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
দিচ্ছে

প্রথম পুরস্কার

১,৫০,০০০ টাকা

আরও হাজার হাজার পুরস্কার

প্রতি বুধবার পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে
খেলা হয়।
আপনার সাদর আমন্ত্রণ

আরো জানবার জন্য :

অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

৬৯ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা-৭০০ ০১৩

ফোন : ২৬ ৪৬৮৮ / ২৬ ৪৬৮৯